দোকানদার

জিতেন্দ্রনাথ রায়

প্রথম সংস্করণ ঃ

৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫

প্রকাশক ঃ

শ্রীমতী প্রতিমা রায়

ষষ্টীতলা, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

মুদ্রক ঃ

মানব কুমার দাস

বঙ্গরত্ন মেসিন প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ

মৃন্ময় বিশ্বাস

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই উপন্যাস ছাপার ব্যাপারে প্রেসে যাঁরা নিরলস পরিশ্রম করেছেন, তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

এ ছাড়া এই উপন্যাস প্রকাশনার ব্যাপারে যাঁরা সাহায্য করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন—

শ্রীদিলীপ কুমার দাঁ (শিক্ষক) শ্রীদীপক কুমার বিশ্বাস (শিক্ষক) এবং শ্রীঅমলচন্দ্র দত্ত (ব্যবসায়ী) কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

জিতেন্দ্রনাথ রায়

এক

এই জেলা শহরের ব্যবসায়ী মহলে জীবন মুহুরীকে আজ কে না চেনে। ক'বছর আগেও দোকানদারদের পাকা খাতা লেখায় জীবনের নাকি জুড়ি ছিল না। সেলস্ ট্যাক্স, ইনকামট্যাক্সের বড় বড় অফিসাররা ওকে এক ডাকে চিনতে পারতো—খাতাপত্রের ব্যাপারে ওর আইনজ্ঞানের জন্যে।

এখন অবশ্য জীবনের সে অবস্থা নেই। দোকানদাররা কেউ আর ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখে না। রাখতে চায় না। লোকটা সৎ। তাতে কি! লোকটার অনেক গুণ আছে। তা থাক্। কে সৎ, কার গুণ আছে, তাতে দোকানদারের কি যায় আসে। দোকানের স্বার্থ, দোকানের ভবিষ্যত অনেক বড়। দোকান গেলে খাবে কি? বাঁচবে কি করে?

জীবন এখন বাড়ীতে থাকতে চায়। কিন্তু নাত্‌নীটা বায়না ধরে। নাত্‌নীকে নিয়ে অলিগলি দিয়ে জীবন নদীর ধারে যায়। সদর রাস্তায় বেরুতে ভয় পায়। সদর রাস্তায় অনেক দোকান। যদি কোন দোকানদার আবার বিদ্রূপ করে।

শহরের যাঁরা এখন খুবই বৃদ্ধ বাসিন্দা, কর্মজীবন থেকে ক'বে অবসর নিয়েছেন সে কথা যাঁদের আর মনেই পড়ে না, তাঁরা কিন্তু জীবনকে জীবন মুহুরী বলেন না। বলেন, জীবনবাবু। কোন বাড়ীতে কমবয়সি যদি কেউ জীবনকে জীবন মুহুরী বলে, বাড়ীর বৃদ্ধ বলেন,—জীবন মুহুরী আবার কে! ওঁর নামত জীবন শর্মা। এ শহরে অতবড় দোকান, আর অতবড় দোকানদার তৈরী হ'ল কৈ!

কথাটা মিথ্যে নয়। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে শহরে প্রবাদ ছিল— যদি বাঘের খাঁটি দুধ চান, জীবনের দোকানে চলে যান।

—দিদি ভাল ছুঁচ কোথায় পাই বলুন তো? সেজ খোকা কোথা থেকে ছুঁচ কিনে আনে, একটু চাপ পড়লেই ভেঙে যায়।

—জীবন বাবুর দোকান থেকে আনিয়ে নেবেন, ভাঙ্‌বে না।

—বাজারের কাছে জীবন শর্মার দোকান না? হ্যা, হ্যা, নাম শুনেছি বটে।

—এই নির্মল, ভাল ঘি কোথায় পাই বলতো? পাড়ার দোকানের ঘি মা আলোচালের ভাতে খেতে পারে না। কেনার পর কদিন মাত্র একটু গন্ধ থাকে, তারপরই কেমন যেন চর্বির মত হয়ে যায়।

—জীবনদার দোকানে যা। ফাইন ঘি। আমরা প্রতি মাসে নিয়ে আসি।

—জ্যাঠামশাই মাসখানেক হ'ল আপনার পাশের বাড়ীতে ভাড়া এসেছি। কাসটম্‌সে চাকরী করি। গত মাসে বদলি হয়ে এখানে এসেছি। আমার মেজ মেয়ের বিয়ে। কোথা থেকে জিনিসপত্র কিনি বলুনতো? মা আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

—জীবনের দোকানে যান। পোলাউ-এর মশলা থেকে বরের টোপর স্যুটকেস সব জিনিস এক দোকানে পাবেন। ষোল-আঠার জন কর্মচারী, যত বড়ই ফর্দ করুন মাল মিল হয়ে ঠিক সময়ে বাড়ীতে চলে আসে।

—অনেকের কাছে নাম শুনেছি বটে। দোকানটা কোথায়?

—বাজার রাস্তার ওপর সব থেকে বড় দোকানটা। বাজারে গিয়ে জীবনের নাম করবেন যে কেউ দেখিয়ে দেবে। কেরসিন তেলের টিন কেটে রঙ করা ছোট্ট সাইন বোর্ডটা মনে হয় আজও দোকানের এককোণে পেরেক ঠুকে আঁটা আছে। দোকানের নাম দিয়েছিল খুব সম্ভব বিড়ি ঘর। তবে ওনামে এখন আর কেউ চেনে না।

দোকানের নাম শুনে ভদ্রলোকের কৌতূহল বাড়ে।

—কেন, কেন, অতবড় দোকানের ওমন নাম কেন?

ইজিচেয়ারে শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ বলেন—তাহ'লে একটা ইতিহাস বল্‌তে হয়। সময় হবে?

—রবিবার তো! বিকেলে আজ আর বেরুবার ইচ্ছে নেই।

বৃদ্ধ নাত্‌নীকে ডাকেন। দু'গ্লাস দুধ আন্‌তে বলেন।

—জীবনের বাবা অনাথ শর্মা ছিল আমার বন্ধু। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়ে রেলের অফিসার হয়। জ্ঞানে মানে শহরে ওরা বেশ নাম করা পরিবার ছিল। জীবনের পূর্বপুরুষের বসত বাড়ীটা এখনো তার প্রমাণ বইছে।

দুধ এসেছে। এক গ্লাস ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে বৃদ্ধ অন্য গ্লাসে চুমুক দেন। দুধের গ্লাস হাতে নিয়ে ভদ্রলোক বলেন—কিন্তু অতবড় দোকানের নাম বিড়ি-ঘর হ'ল কেন?

দুধের খালি গ্লাসে একটু জল ঢেলে নাড়া দিয়ে গলায় ঢেলে বৃদ্ধ বলেন—ঐতো দোষ আমার। আজকাল যা বলতে যাই, কিছুতেই গুছিয়ে বলতে পারি না। স্বামীর সঙ্গে মতের মিল না হওয়ায় অনাথের দিদি বাপের বাড়ী এসে থাকতো। অনাথ রেলের কাজে বৌ নিয়ে বাইরে থাকতো। জীবনকে আমি যখন প্রথম দেখি, ও তখন বছর খানেকের ছেলে। পূজোর ছুটিতে অনাথ বাড়ী এসেছিল। যাবার সময় বাড়ীর নীচের তলাটা আমাকে ভাড়া দিয়ে গেল। আমি ছিলাম ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কন্‌ফিডেনসিয়াল ক্লার্ক। বহুদিন ভাড়া ছিলাম ওদের বাড়ীতে।

বৃদ্ধ থামলেন। সামনের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিলেন। খেই ধরিয়ে দিলেন ভদ্রলোক।

—বিড়ি-ঘরের কথাত' কিছু বললেন না?

—হ্যা হ্যা এবার বলছি। খুব সম্ভব প্লেগ রোগে অনাথ মারা গেল। জীবনকে নিয়ে জীবনের বিধবা মা যখ্‌ন শ্বশুরের ভিটেতে ফিরে এলেন, জীবনের বয়স তখন বছর চার। মন গুম্‌ড়ে গুম্‌ড়ে বছর তিন চার বাদে থাইসিস্‌ হয়ে জীবনের মাও চলে গেলেন। তবে হ্যা, ভাইপোকে বুকে আঁকড়ে ধরেছিল অনাথের দিদি। কোনদিন জীবনকে এতটুকু অবহেলা করেননি। একটু বেশী বয়সে হলেও জীবনকে আমিই স্কুলে

ভর্তি করে দিয়েছিলাম। আমার বাড়ী ভাড়া আর সামান্য কিছু গচ্ছিত দিয়ে অনাথের দিদি বহু কষ্টে সংসার চালাতেন। ছোটবেলা থেকেই জীবন কিন্তু সোনার টুকরো ছেলে ছিল। আমার কাছে, পিসীর কাছে একটু আধটু সাহায্য নিত বটে, তবে মোটামুটি নিজের চেষ্টাতেই প্রতি বছর ক্লাসে ফার্ষ্ট হ'ত। মাষ্টার মশাইদের খুব প্রিয় ছাত্র ছিল।

বাধা দিয়ে ভদ্রলোক বলেন—জ্যাঠামশাই, আসল কথাটা আমার বোধহয় আর শোনা হবে না।

—কোন কথাটা ?

—বিড়ি ঘরের কথা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বৃদ্ধ আবার শুরু করেন।

—হ্যা, কথায় বলে না কপালে নেইকো ঘি ঠক্‌ঠকালে হবে কি ! জীবন সবে ফোর্থ ক্লাস থেকে থার্ড ক্লাসে উঠেছে, জীবনের পিসীর হ'ল কঠিন অসুখ। কেউ বলে কালা জ্বর, কেউ বলে টাইফয়েড, কেউ বলে ম্যালেরিয়া, জীবনের পড়াশুনা মাথায় উঠল। সারাদিন পিসীর সেবা করতে করতেই ছেলেটা নাজেহাল হয়ে যেত। জীবনের এক জ্ঞাতি কাকা ছিল। ব্যাটা মহা ধরিবাজ লোক। প্রায়ই বাড়ী বিক্রি করে পিসীর চিকিৎসা করার জন্যে জীবনকে উপদেশ দিত। আমি বাড়ী ভাড়াটা কিছু বাড়িয়ে দেওয়া সত্ত্বেও প্রায়ই বেচারাকে আমার কাছে টাকা ধার করতে হ'ত। পিসী একটু সুস্থ হলেই, যে কোন একটা চাকরী করে দেবার জন্যে জীবন আমাকে ধরতে লাগল। ওর বয়স তখন পনের-ষোল। কিইবা চাকরী দিই। তবুও জেলাশাসক কেনার্ড সাহেবকে ধরে একটা বয়ের চাকরী করে দিলাম। চাকরীটা পাবার পর থেকে প্রায়ই দেখতাম জীবন বেশ রাত করে বাড়ী ফিরতো। এ ব্যাপারে কোন কথা জিজ্ঞেস করলে, কথার উত্তর না দিয়ে মাথা নীচু করে চলে যেত। শর্মা পরিবারের অবস্থা দেখে মনে বড় দুঃখ পেতাম। আস্তে আস্তে আমার টাকাটা শোধ করে দেবার কয়েক মাস পরেই একদিন সকালে প্রণাম করে জীবন বল্‌লে, ও চাকরী ছেড়ে দিয়েছে। অনেক কষ্টে শতখানেক টাকা যোগাড় করে পঞ্চাশ টাকা সেলামী আর

দশ টাকা ভাড়ার চুক্তিতে বাজারের কাছে একটা ঘর ভাড়া নিয়েছে। পান বিড়ির দোকান দেবে। ব্যবসা করবে।

বৃদ্ধ বাধা পান। ভদ্রলোক বলেন—জ্যাঠামশাই এক মিনিট। আসছি।

সিগারেট ধরিয়ে কয়েকটা টান দিয়ে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নিজের জায়গায় বসেন। বৃদ্ধ বলে চলেন।

—গণেশ পুজোর দিন ওর দোকানে গিয়েছিলাম। দেখলাম বেশ তাড়াতাড়ি বিড়ি বাঁধছে। অবাক হয়ে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, বিড়ি বাঁধা শিখলে কবে? উত্তরে ও বলেছিল—সাহেবের কাছ থেকে ছুটি পাবার পর প্রত্যেক দিন সন্ধ্যেতে শিখতাম। কথাটা বলেই ও হেসে ফেলেছিল। কিন্তু ঘর দেখে বাপু আমার একটুও পছন্দ হয়নি। তবে ওর দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে জায়গাটা বেশ ব্যবসার জায়গা। সে যাই হোক, কপাল দোষেই বলুন আর কপাল গুণেই বলুন, এইভাবে শর্মা বাড়ীর ছেলে হ'ল পান বিড়ির দোকানদার।

কপাল কুঁচকে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেন—জীবনবাবু সেই পান বিড়ির দোকান থেকেই কি.........

ভদ্রলোকের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বৃদ্ধ বলেন—যে কাজের মানুষ, কর্মে সেতো এগোবেই। ওর দোকানের লাগোয়া ঘরগুলো ভাড়া নিয়ে ও আস্তে আস্তে দোকান বাড়াতে থাকলো। লাভ লোকসানের ওঠা নামায় ও যে কখনো মার খায়নি এমন নয়। কিন্তু অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে নতুন উদ্দমে আবার লড়াই শুরু করতো। মাঝে মাঝে আমার কাছে টাকা ধার নিত। একবার ওকে আমি হাজার টাকা অবধি ধার দিয়েছিলাম। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। বিরাট ধৈর্য্য, প্রচণ্ড অধ্যবসায়, আর দাঁতে দাঁত দিয়ে মরা বাঁচার সঙ্গে লড়াই করার দারুণ প্রচেষ্টার দরুণই ও ধাপে ধাপে প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে চলল। জীবন বাড়ী না ফেরা অবধি সদর দরজা বন্ধ করা যেত না। রাত সাড়ে নটা ; দশটা তবু ওর পাত্তা থাকতো না। খাওয়া-দাওয়া সেরে মাঝে মাঝে টুক টুক করে

ওর দোকানে যেতাম। সব দোকানদার যখন দোকান বন্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে, ওর দোকানের সামনে তখনো ভীড়। আমাকে দেখে তবে ওর জ্ঞান হ'ত যে রাত হয়েছে। খরিদ্দারদের হাত জোড় করে বলত—দয়া করে কাল আসুন। কর্মচারীরা সব হাপ্‌সে গেছে। আমিও ক্লান্ত।

ভদ্রলোক বলেন—তা'লে শুতে শুতে আপনাদের তো রাত দশটা বেজে যেত বলুন ?

—রাত দশটা কি বলছেন! ভেতর দিয়ে কপাট আট্‌কে ক্যাশ মিল করে কোন্‌টা আছে কোন্‌টা নেই, কোন্‌ মালটা আজই ডেলি-প্যাসেঞ্জারকে আনার অর্ডার দিতে হবে, কোন্‌টা নিজে গিয়ে আনতে হবে, সব কিছুর ব্যবস্থা করে, তবে বাড়ী ফিরতো।

আপনাদের তবে তো বেশ কষ্ট হ'ত ?

—কি করবো বলুন ? পড়েছি যবনের হাতে খানা খেতে হবে সাথে। তবে আমরা কেউ বিরক্ত হতাম না। ছেলেটা অত রাতে ফিরে মুখে কিছু দিয়েই বড় হ্যাকিকেনটা জ্বালিয়ে খাতা পত্রের কাজ নিয়ে বসত। কত রাত অবধি কাজ করতো কে জানে! তবে কাক ভোরে উঠে স্নান সেরে নিত প্রতিদিন।

—জীবনবাবু বিয়ে করেন নি ?

বৃদ্ধ মৃদু হাসেন।

—সেটাত আর এক ইতিহাস। বিয়ে কি আর করতে চায়। আমার স্ত্রী বিয়ের কথা বল্‌লে, ও বল্‌ত—এখনত সময় নেই কাকীমা, একটু সময় পেলে বলবো। এই সময় আমার ছেলেবেলার বন্ধু দুর্গাদাসের চিঠি পেলাম। দুর্গা মেয়ের বিয়ের জন্য তখন খুব ব্যস্ত। ষোল উত্তীর্ণ হয়ে সতেরোয় পড়েছে। আর কি মেয়ে ঘরে রাখা যায়। দুর্গাদাসের পূর্বপুরুষ ছিল বর্দ্ধমানের জমিদার। অবশ্য দুর্গার কপালে জমিদারী সুখের বিশেষ কিছুই জোটেনি। কিন্তু জমিদারীর ঠাটবাটগুলো ও বহু যত্নে আগলে চল্‌ত। দারুণ সংস্কারাচ্ছন্ন ছিল ওর দৈনন্দিন জীবন। ভেবে দেখলাম দুর্গারা জীবনদের পাল্‌টি ঘর। তাই একদিন আমিই

জীবনকে ডেকে বুঝিয়ে বললাম। পিসীমা বৃদ্ধা হয়েছেন। আজ আছেন কাল নেই। এখন কাউকে আনার দরকার। ও বল্‌লে—আপনি দেখুন। সুযোগ বুঝে টুক করে দুর্গার মেয়ের কথাটা পাড়লাম। ও বললে—এ ঘরের মেয়ে কি আনা উচিৎ হবে কাকাবাবু? আপনি বরং কোন দোকানদারের মেয়ে দেখুন।

রাস্তায় বন্দেমাতরম্ আওয়াজ। বৃদ্ধ থামেন। ভদ্রলোক বলেন—ও কিছু নয়। স্বদেশীদের মিছিল।

—দুর্গাবাবু দোকানদারকে মেয়ে দিলেন?

—দেবে না কেন? ব্রিটিশ সরকারের গোলামীর চেয়ে স্বাধান ব্যবসা অনেক ভাল। পাত্রের বংশ পরিচয়, স্বভাব চরিত্রই আসল কথা। তবে হ্যা, দু পক্ষের সব ঝামেলা আমাকেই পোয়াতে হ'ল। শুন্‌লে অবাক হবেন, বৌভাতের দিনও ওবেলা বারটা অবধি দোকানদারী করেছিল। বিয়ে হ'ল শ্রাবণ মাসে। সেবার বিজয়ার প্রণাম করতে এলে আমার বিধবা মেয়ে শ্যামলী ওকে বলেছিল—জীবন তোমার ভাগ্যটা খুবই ভাল। তোমার বৌ শহরের সেরা বৌ। উত্তরে ও কি বলে ছিল জানেন? বললে—তাই নাকি? তা হবে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন—দুর্গাদাসের মেয়ের অবস্থাটা!

হা হা করে বৃদ্ধ হাসতে থাকেন। ভদ্রলোকের মনে সন্দেহ উঁকি দেয়।

—বিয়ের পর মেয়েটি সুখী হ'ল না। না?

—প্রথম দিকে হতে পারিনি বটে। তবে পরে সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল। ওদের বিয়ের পর প্রথম প্রথম শ্যামলীর মার কাছে ওদের সম্বন্ধে অনেক কথা শুন্‌তাম। শ্যামলীর সঙ্গে দুর্গাদাসের মেয়ে রমলার ভাবটা আস্তে আস্তে বেশ ভালই জমেছিল। তারপর রিটায়ার করলাম। বাড়ী কিনে এ পাড়ায় চলে এলাম।

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ান।

—তবে কাল সকালে জীবনবাবুর দোকানেই ফর্দ দিয়ে আসবো। হ্যা দামটাম বেশী ধরে না'ত ?

—কোনদিনও না। যেমন কোয়ালিটির মাল নেবেন তেমন দাম ফেলবে। সাহেব জেলাশাসক, সাহেব এস পি থেকে আরম্ভ করে গ্রামের চৌকিদার দফাদার সবাই জীবনের খরিদ্দার। শহরে সবাই ওকে ভালবাসে। বিয়ের বাসর থেকে সাহিত্যের আসর অবধি সব জায়গাতেই ও নেমন্তন্ন পায়।

—আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, জীবনবাবুকে জানাব নাকি ?

—জানাতে পারেন। তবে দামের ব্যাপারে কোন হেরফের হবে না। চেনা অচেনা খরিদ্দার ওর কাছে সবাই সমান।

দুই

বিয়ের পর প্রথম প্রথম বুড়ি পিসীকে রমলা দু'চোখে দেখতে পারত না। সারাদিন কোঁত পারে। মুখ দিয়ে লোল পড়ে। সব সময় বিড় বিড় করে কি সব বকে। জামা না পড়ে কুঁজো হয়ে হাঁটে। মাই দুটো ঝোলে আর দোলে। যেন রমলার বাপের বাড়ীর বৈঠকখানা ঘরের বড় দেওয়াল ঘড়িটার পেণ্ডুলাম। বুড়িটাকে দেখে রমলার যেমনি ঘেন্না লাগে তেমনি হাসি পায়।

মাল কিনতে মাঝে মাঝে জীবন মোকাম যায়। মোকাম জায়গাটা যে কোথায় নতুন বৌ রমলা তার কিছুই বোঝে না। এমন কি স্বামীর মুখে মোকাম শব্দটা যেদিন প্রথম শোনে, হাসতে হাসতে পেটে ওর খিল লেগে যায়। এমন শব্দ ও বাপের কালে শোনেনি। জায়গাটা বোধহয় বহুদূরে। কিন্তু সে যাই হোক, মোকাম ফেরৎ স্বামীর চোখ মুখের অবস্থা দেখে রমলা চমকে উঠত। মনে মনে মায়া হ'ত।

কাজের ফাঁকে সুযোগ পেলেই শ্যামলী দোতলায় উঠে আসে রমলার কাছে। সকাল বা বিকেলের দিকে এলেই শ্যামলী দেখে রমলা খাটে বসে পশ্চিম দিকের জানলার পর্দাটা ফাঁক করে পাশের বাড়ীর কাকে যেন লক্ষ্য করছে। শ্যামলীকে দেখলেই তাড়াতাড়ি এসে খাটে বসায়। গল্প জোড়ে।

—পাশের বাড়ীর ঐ ছিপ্ ছিপে ছেলেটা কোন্ অফিসে যেন চাকরী করে, ওর বিয়ে তো আমাদের বিয়ের মাসেই হয়েছিল না দিদি ?

—হ্যা। তোমাদের বিয়ের দিন দশেক আগে।

শ্যামলীর গলার স্বর গম্ভীর। একটু বিরক্ত।

—ভারি ভাল লাগে ওদের স্বামী-স্ত্রীর মিল। ছেলেটা রোজ বিকেলে অফিস থেকে বাড়ী ফিরে স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করে। গান বাজনা করে। হাসি ঠাট্টা করে। রবিবার বা ছুটির দিন তো কথাই নেই। বৌ সঙ্গে করে কত বন্ধু-বান্ধব আসে। গল্প করে। চা খায়। জানেন দিদি, বৌটার কিম্বা নিজের একটু শরীর খারাপ হলেই ছেলেটা মনে হয় ছুটি নিয়ে নেয়। তখন সারাদিন ওরা এক ঘরে থাকে! লম্বা ছুটি পেলেই ছেলেটা বৌ নিয়ে বাইরে বেড়াতে চলে যায়। হানিমুন না কি যেন বলে!

রমলা মুচ্ কি হাসে। লাজুক হাসি।

শ্যামলী বোঝে রমলার ব্যথাটা। তবু শাসনের সুরে বলে—তুমি যে ভাই দোকানদারের বৌ! ঐ ছেলেটা অফিস বাবু। এসব অসুবিধা তোমাকে তো মেনে নিতেই হবে। তোমার বাপ্ মা সবকিছু দেখেশুনেই তো তোমার বিয়ে দিয়েছেন।

বাপ মার কথা উঠতেই রমলার চোখ দুটো জ্বলে ওঠে। মুখ ফেরায় অন্যদিকে।

—থাক দিদি বাপ-মার কথা। রেণী, আমার ছোটবেলার খেলার সাথী। বায়স্কোপ দেখত, পালা শুন্ত বলে, একটু বড় হবার পর বাবা ওর সঙ্গে মিশতে দিতেন না। মা বলত আইবড় বেলায় ওসব দেখলে লোকে

নাকি নিন্দে করে। ভাল বিয়ে হয় না। বিয়ের পর বরের সঙ্গে ওসব দেখতে হয়। রেণীর বিয়ে হয়ে গেল আমার বিয়ের তিন বছর আগে। আমার জন্যে বাবার কিছুতেই বর পছন্দ হয় না। ঘর বর পছন্দ হয়ত টাকা পয়সায় কুলায় না। তারপর কি হ'ল! যত সব বাজে কথা।

শ্যামলী রমলার গায়ে হাত বোলায়।

—ঠিক আছে, আমি তোমায় মাঝে মাঝে টকী নিয়ে যাব।

—আপনি?

রমলা মুচ্‌কি হাসে। একটু চিন্তা করে।

—না দিদি থাক্‌। টকী গিয়ে আর কাজ নেই।

—আচ্ছা, আমি জীবনকে বলব। মাঝে মাঝে তোমায় নিয়ে যেন টকী যায়।

—বলে কি হবে দিদি! সেই সকালে দোকানে চলে যান আর রাতে ফেরেন। তুপুরে কর্মচারীতে খাবার নিয়ে যায়, তার প্রায় সবটুকুই ফেরৎ আসে। দোকানে বসে কি খাওয়া হয়। রাতেই যা একটু শান্তিতে খেতে পায় মানুষটা। কাজের কি শেষ আছে দিদি! খাতা-পত্রের কাজ সেরে কখন শোন্ কে জানে! সকালে আমার যখন ঘুম ভাঙে তখন ওনার স্নান সারা হয়ে যায়।

—রাঁধুনী রেঁধে যাবার পর ডালে বেশী করে লবণ দিয়ে দেবে। মাছটা পুড়িয়ে রাখবে। দেখবে দোকান দোকান বাতিক ঘুচে যাবে। তোমার দিকে মন দেবে।

শ্যামলী বুদ্ধি দেয় রমলাকে।

শ্যামলীর উপদেশ রমলা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। কোনদিন ডালে লবণ। কোনদিন বা তরকারীতে ঝাল। কোনদিন মাছটা পোড়া। কিন্তু রমলার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। মুখে ভাল লাগলে জীবন একটু বেশী খায়। ভাল না লাগলে কম খায়। কোন কিছুতেই মানুষটার কোন অভিযোগ নেই। রাগ কাকে বলে লোকটা মনে হয় জানেই না। জীবনকে খেতে দিয়ে রমলা আড়ালে

দাঁড়িয়ে কতদিন মজা দেখার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আধখাওয়া নির্বিকার ক্লান্ত স্বামীকে দেখে রমলা নিজেই কষ্ট পেয়েছে।

সকালে জীবন দোকানে বেরুচ্ছে। পিছু ডাকে শ্যামলী। কড়া গলায় শ্যামলী বলে—জীবন, এখন বিয়ে করেছ। * এত বেশী দোকান দোকান করলে আর চলবে না। বৌটাকে একটু দেখতে হবে। নতুবা সংসারে অশান্তি হবে।

জীবন বিরক্ত। তবু মুখে হাসি টানে। কৃত্রিম হাসি।

—কে বল্‌লে দেখি না? তবে পরপর পূজো চল্‌ছে!

—দেখা মানে তাকিয়ে দেখা নয়। মাঝে মাঝে বৌকে নিয়ে টকী যেতে হয়। তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করে বাড়ী ফিরতে হয়।

শ্যামলীর গলার স্বর এবার আরো কড়া।

—কি করি বলুন দিদি! অফিস বাবুদের মত স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করতে কিম্বা মাঝে মাঝে টকী যেতে আমারো ইচ্ছে করে। কিন্তু যাই কি করে! ঠিক সময় মত দোকান খোলা বন্ধ না করলে খরিদ্দার নষ্ট হয়, ব্যবসার ক্ষতি হয়।

—বিশ্বাসী কাউকে দোকানে বসিয়ে রাখলেই পার।

জীবন হেসে ফেলে।

—কি যে বলেন দিদি! বিশ্বাসী কেউত' দূরে থাক্; অপরিণত নিজের ছেলেকে দোকানের ক্যাশে বসালে দোকানের যে কি হাল হয়, আশপাশের দোকান দিয়ে আমি তা অনেকবার দেখেছি। দোকানে থাকতেই কত সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে যায়। খরিদ্দারদের সঙ্গে সাঁট কোরে ফর্দের চারটে মালের জায়গায় ছটা মাল ঝোলায় পুরে দেওয়া, পাঁচ সেরের জায়গায় দুবারে দশসের ঢেলে দেওয়া, কর্মচারীদের এসব অসাধুতা কতদিন যে হাতেনাতে ধরেছি তার ঠিক নেই। আসল কথা কি জানেন দিদি, সব সময় সব দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা ছাড়া দোকানদারী ব্যবসার কোন বিকল্প নেই। বিশ্বাসী লোক, ভাল লোক, এসব ঠুন্‌কো কথা। মন বোঝান শব্দ মাত্র।

জীবন কথা কম বলে। কিন্তু কথা বললে ওর সঙ্গে পেরে ওঠা মুস্কিল। শ্যামলী আর কথা বাড়ায় না। বাঁকা চোখে কয়েক বার জীবনের দিকে তাকায়। নীচের ঠোঁটের বাঁ কোনটা কামড়ে ধরে।

আজও বিকেলে রমলা পশ্চিমের জানলা দিয়ে পাশের বাড়ীর দিকে তাকিয়ে ছিল। শ্যামলী আসে। মুচকি হেসে রমলা বলে—দিদি, পাশের বাড়ীর বৌটা হারমনিয়াম বাজিয়ে গান গাইছিল। গলাটা বিচ্ছিড়ি। হারমনিয়াম বাজাতে জান্‌লে দেখিয়ে দিতাম গান কাকে বলে।

—কি দরকার তোমার ওসবে ?

—তা বটে ! আচ্ছা দিদি, বৌটা নাকি খুব শিক্ষিত ?

—হ্যা। কলেজ পাশ। তাই পাড়ার কারুর সঙ্গে মেশে না।

—গতকাল বিকেলে ঘটিহাতা ব্লাউজ পড়ে পিঠ বের করে বরের সঙ্গে মনে হয় টকী দেখতে যাচ্ছিল। রঙ্‌টা কাল। ছেলেটার সঙ্গে একদমই মানায় না।

—কিন্তু তুমি অমন করে দেখ কেন ? অন্য রকম ভাবতে পারেতো !

—তা হতে পারে দিদি। ক'দিন আগে বৌটা মনে হয় আমাদের জানলা বরাবর একটা কাপড় ঝুলিয়ে রেখেছিল। ছেলেটা সরিয়ে দিয়েছে।

—ছি, কোন একটা নিন্দে রটলে ?

শ্যামলী রমলাকে অনেক কথা বলে। উপদেশ দেয়। নিজের ঘরে ফিরে আসে।

রমলা নানাভাবে স্বামীকে হাত করতে চেষ্টা করে। এইতো সেদিন রাতে জীবন খেতেই পেল না। শরীর খারাপ বলে রাঁধুনী ছুটি নিয়েছিল। সামান্য জ্বর হয়েছিল রমলার। তবে এমন জ্বরে দু'তিন জনের কেন, দশ জনের রান্নাও করা যায়। ইচ্ছে করেই রমলা রাঁধেনি। জীবনকে জব্দ করতে চেয়েছিল। দোকান থেকে ফিরে স্নান সেরে খেতে বসে জীবন অবাক। খাবার নেই। কাছে পিঠে রমলা নেই। ব্যাপার কি ! বুড়ি পিসী চেঁচামেচি করাতে রমলা ঝাঁঝিয়ে ওঠে।

—সারাদিন জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। রঁাধবো কি করে! আমার আর কে আছে।

রমলার কথা শুনে জীবনের খাওয়া মাথায় ওঠে। ছুটে এসে রমলার কপালে হাত বুলিয়ে জীবন ছোটে ডাক্তারের খোঁজে। কিন্তু অত রাতে কোন ডাক্তার আসতে চায়নি। কোন ওষুধের দোকানও জীবন খোলা পায়নি। বাড়ী ফিরে রমলার মাথাটা নিজের হাঁটুর ওপর রেখে জীবন এক হাত দিয়ে রমলার মাথায় হাত বোলায়। অন্য হাতে হাতপাখা টেনে বাতাস দেয়। সারারাতে যখনই রমলার ঘুম ভেঙেছে, তখনই দেখে লোকটা একভাবে পাখা টেনে যাচ্ছে। লোকটার কি ঘুমও পায় না! না, পায় না। বরং গভীর সহানুভূতির সঙ্গে জীবন জিজ্ঞেস করে—এখন একটু ভাল বোধ করছতো?

জীবনকে দেখে রমলার মায়া হয়। এতটা বারাবারি না করলেই হ'ত।

—আপনি শুয়ে পড়ুন।

জীবন শুতে পারেনি। রমলা কোন্ ফাঁকে বুকের কাপড় সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু পাছে রমলা বিরক্ত হয়, জীবন তাই হাতের আঙুল-গুলোকে রমলার মেঘের মত চুলের মধ্যে নিষ্ঠুরভাবে বন্দী রেখেছে। হাতটাকে এতটুকু সরতে দেয়নি রমলার বুকের দিকে। কতবার রমলা চিৎ হয়ে হাত দুটোকে মুঠো করে আঁড়মড়া ভাঙার অছিলায় জীবনের কোমড়ের দুপাশ দিয়ে সাট করে বুকটাকে উঁচু করেছে। কিন্তু তবু জীবন হাত সরায়নি। রমলার বগল দুটো ভারি সুন্দর। একটিও লোম নেই। চিৎ হয়ে শুয়ে হাত দুটোকে মাথার দিকে সাট করলে দু'বগলের মাঝখান দিয়ে দুদলা মাংস কি সুন্দর উঁচু হয়ে ওঠে। দু'এক ফোঁটা আল্‌তা দিয়ে যেন হিমানী চট্‌কানো। কতবার জীবনের ইচ্ছে করেছে দিই একটু চুষে; কিম্বা আল্‌তো করে কামড়ে। কিন্তু পাছে অসুস্থ রমলা বিরক্ত হয়, সারারাত তাই পাখা টেনেছে পরম সংযমে। চোখের সামনে সবে-জল-আসা ডাবে ভরা রমলার বুকটা শ্বাস প্রশ্বাসের তালে

তালে কি সুন্দর ওঠা নামা করছে। ও দুটো যেমনি নিটোল, তেমনি গোল, তেমনি দৃঢ়। বোঁটা দুটো যেন পায়েসের কিস্‌মিস। ডেবডেবিয়ে তাকিয়ে রয়েছে জীবনের দিকে। জীবন কিন্তু হাত দুটোকে কিছুতেই সরতে দেয়নি। বরং ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে ছোটে ডাক্তারের বাড়ী। রমলাকে ডাক্তার দেখিয়ে, ওষুধপত্রের ব্যবস্থা কোরে, তবে যায় দোকানে। ডাক্তার বার বার বলে, সামান্য জ্বর, আজই ছেড়ে যাবে। কিন্তু তবু জীবনের উৎকণ্ঠার সীমা নেই। রাতে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে জীবন সামান্য কিছু মুখে দেয়। খাতাপত্রের দিকে একবারও না তাকিয়ে রমলার মাথায় হাত বুলিয়ে জীবন জিজ্ঞেস করে—আজ আর জ্বর আসেনিতো?

রমলা জীবনের কথার কোন উত্তর দেয়নি। ডিম ল্যাম্প জ্বেলে জীবন পাশে শুলে রমলা নাবালিকার মত হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে। মুখ গুঁজে দেয় জীবনের প্রশস্ত বুকে। বালিশের ঢাকা দিয়ে জীবন আল্‌তো হাতে রমলার চোখ মুছে দেয়, চুমু দেয়। দেহের সমস্ত আবরণ একটি একটি করে খুলে রমলা গভীর রাত অবধি সবরকমভাবে স্বামীকে সেবা করে। কত যন্ত্রণা। শ্বাসরোধ করা কত কষ্ট। দাঁতে দাঁত চেপে রমলা সব সহ্য করে। স্বামীকে হাত করতেই হবে। সারা দেহ জ্বলে গেছে। উরু দুটো কতবার অবশ হয়ে গেছে। তবু রমলা এতটুকু আর্তনাদ করেনি। বিয়ের আগে রমলা মায়ের কাছে বহুবার শুনেছে —স্বামী যেমনি হ'ক, স্বামীকে কষ্ট দিতে নেই। স্বামীকে কষ্ট দেওয়া পাপ। স্বামীই দেবতা।

জীবন এখন তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে চেষ্টা করে। রমলাও হয়েছে এ বাড়ীর খাঁটি বৌ।

পিসী শাশুড়ীকে রমলা আর ঘেন্না করে না। দামী ছিট কিনে জামা তৈরী করে দিয়েছে। পোষাক পরিচ্ছদ যতটা পেরেছে নিজের রুচিমত করার চেষ্টা করেছে। এখন সময় পেলেই রমলা পিসীর কাছে

আসে। পাশে বসে। গল্প শোনে। পিসীর স্বামীর কথা শোনে। পিসীর শ্বশুর বাড়ীটা ছিল ছারপোকায় ভরা দামী খাটের বিছানার মত। স্বামীটা ছিল পাঁড় মাতাল। প্রায় প্রতিদিন পিসীকে মারধর করত। পিসী তাই শ্বশুর বাড়ীর সুখ ছেড়ে বাপের বাড়ীর শান্তির নীড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল।

আজ দুপুর থেকে রমলার মনটা খুশিতে ভরপুর। রমলার মামা এসেছেন। নেমন্তন্ন করতে। মামাতো বোনের বিয়ে। রমলার থেকে বছর দুয়েকের ছোট হলেও, রমলার বাল্য-বান্ধবী, কিশোরী বয়সের মনের যত গোপন কথার একমাত্র সাথী ছিল ঐ মামাতো বোনটি।

—বেলার বিয়েতে যাবই মামা। আপনি জামাইকে বুঝিয়ে বলবেন।

—তাতো বলবই। তবে জীবন বাবাজী যদি নিতান্ত না যেতে পারে, খোকা এসে তোকে নিয়ে যাবে।

মামার কথায় রমলার দুধে আল্‌তা মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। বেজার মুখে রমলা বলে—না মামা, আপনি বুঝিয়ে বললে মনে হয় রাজী হয়ে যাবে।

রাতে খেতে বসে মামার সঙ্গে জীবনের কথা হয়।

—বেলার বিয়ে। অন্তত বিয়ের আগের দিন তোমাদের যেতেই হবে।

নরম সুরে জীবন বলে—দোকান বন্ধ রেখে আমি কেমন করে যাই বলুন? তার চেয়ে·········

বাধা দিয়ে মামা বলেন—তোমার সঙ্গে ছাড়া রমলা কারুর সঙ্গে যেতে রাজী নয়।

—তা'লে যেতে হবে। তবে বিয়ের আগের দিন নয়; বিয়ের দিন যাব। দোকান দু'দিন বন্ধ থাকবে।

বিয়ে বাড়ী যাবার বেশ কয়েক দিন আগে থেকেই রমলা সব থেকে বড় প্যাঁটরাটা গুছিয়ে চলেছে। জীবনকে বলে পছন্দমত অনেক জিনিস দোকান থেকে আনিয়ে নিয়েছে। বোনের বিয়েতে মামার বাড়ী গিয়ে এমন সাজ্ সাজ্বে যাতে সবার তাক লেগে যায়। বিভিন্ন সময় পরার জন্যে বিভিন্ন রঙের শাড়ীগুলো কতবার কত পরিশ্রম করে যে রমলা প্যাঁট্রাতে গুছিয়েছে, সেকথা অন্য কারুর কাছে শুন্লে ও নিজেই লজ্জা পেত।

রমলার সবই ভাল। শুধু মাঝে মাঝে ভুলে যায় যে ও দোকানদারের বৌ। বরাত ওদের সঙ্গে চলে। বিয়েতে মামার বাড়ী যাবার আগের দিন সকালে জীবন চা খাচ্ছে। রমলা বলে—কাল ক'টার ট্রেনে যাব ?

—সকালের ট্রেনে।

—কর্মচারীদের দুদিন ছুটি দিয়েছ তো ?

—দিয়েছি। মাস পয়লায় দোকান বন্ধ থাকবে শুনে ওরা অবাক হয়ে গেছে।

—তুমি কি বললে ?

রমলার সতর্ক দৃষ্টি তন্ন তন্ন করে কিছু খুঁজে ফেরে জীবনের মুখের ওপর।

—কি আবার বল্বো ! যতটা পারছি সবদিক সামাল দেবার চেষ্টা করছি।

—জীবনদা !

কে যেন ডাকছে। খরিদ্দার বোধ হয়। চায়ের কাপ রেখে জীবন বাইরের বারান্দায় আসে।

—কি খবর ?

—কাল রাতে সিঁদ কেটে আপনার দোকানে চুরি হয়ে গেছে।

পড়িমরি করে জীবন ছোটে দোকানের দিকে। চাবির গোছাটা রমলা হাতে তুলে না দিলে সেটাও জীবন ফেলে যেত। রমলা তাকিয়ে থাকে প্যাঁট্রাটার দিকে। প্যাঁট্রাটাও রমলাকে দেখছে। মুখ ভেঙাচ্ছে। লাথি দেখাচ্ছে। উল্টো লাথি। দুপুরে কোন কর্মচারী এল না

জীবনের খাবার নিতে। উদ্বিগ্ন রমলা প্যাঁটরার কথা ভুলে জীবনের খাবার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বেচারার পিত্তি পড়বে। শেষে শ্যামলীর হাতে খাবারটা তুলে দিতে বাধ্য হয়।

সারারাত জীবন হাহুতাশ করেছে। চোখের পাতা যতবার বুঁজতে গেছে আপনা থেকেই খুলে গেছে।

সকালে জীবন বলে—কাকাবাবুকে বলি, তোমাকে মামার বাড়ী দিয়ে আসুন।

—আমি প্যাঁটরা খুলে ফেলেছি। এখন আর সাজাবার সময় নেই।

বিকেলের দিকে পাশের বাড়ীর বৌটা আসে। হয়ত রমলাকে সান্ত্বনা দিতে। কলেজ পাশ করা বৌ। রমলা নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে। কথায় কথায় বৌটা বলে—শ্বাশুড়ীর কাছে শুনেছি, এনাদের কিছুই ছিল না। এখন অবশ্য জমাজমি টাকাকড়ি অনেক হয়েছে। কিছু গেলে এমন আর কি ক্ষতি! মন খারাপ করবেন না।

অবাক চোখে রমলা তাকিয়ে থাকে বৌটার দিকে।

তিন

১৯৪৭ সাল। ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। নিন্দুকে বলে ভারত ভাগ হয়। সাদা চামড়ার বিলিতি সাহেবরা চলে যেতে থাকে দ্রুত গতিতে। শহরের লোক সংখ্যা কিন্তু কমে না। বরং উদ্বাস্তুদের ভিড়ে বেড়ে যায় আরও অনেক বেশী। জীবনের দোকানেও বেচাকেনা বেড়েছে বহুগুণ। বড় ব্যবসা আরও বড় হয়েছে।

নানা লোকের নানা কথা জীবনের কানে আসে। শয়তান ইংরেজ এতদিনে বিদেয় হয়েছে। দুশো বছর ধরে ভারতবাসীকে ওরা অনেক শুষেছে। এখন আর শুষতে পারবে না। সাধারণ মানুষ এখন দুবেলা দুমুঠো খেয়ে-পড়ে বাঁচতে পারবে। গরীব মানুষদের আর ভাবনা নেই।

স্বাধীন দেশে কেউ ছোট নয়। কোন কাজও ছোট নয়। যার যার মত খাটবে খাবে।

মাত্র কয়েকটা বছর কেটেছে। ব্যবসার সব ব্যাপারেই জীবন কেমন যেন গরমিল লক্ষ্য করে। ব্যবসার গতি প্রকৃতি রাতারাতি ওলট-পালট হতে থাকে। মাঝে মাঝে জীবনের মনে হয়, এক রাজার শোষণের বদলে লক্ষ রাজার লক্ষভাবে শোষণের তাণ্ডব শুরু হয়েছে সারা দেশ জুড়ে। প্রতিদিন খবরের কাগজে নেতাদের ভাল ভাল বক্তৃতা পড়ে জীবন কিছুটা উৎসাহ পায়। মনে মনে ভাবে এবার দেশ নিশ্চয়ই গড়ে উঠবে। অসৎ লোকগুলো এবার কোণঠাসা হবেই হবে। দেশের মানুষ শান্তিতে বাঁচবে। কিন্তু নেতারা যা বলেন বাস্তবে জীবন ঠিক তার উল্টোটা দেখতে থাকে। সমাজে অসাধুতা, শঠতা, শয়তানী বেড়ে যেতে থাকে ইংরেজরা চলে যাবার পর সাধারণ মানুষের ফুল প্যাণ্ট পরার মত। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিষগুলো হঠাৎ হঠাৎ—বাজার থেকে উধাও হয়ে যাবার হিড়িক লেগে যায়। আজ চাল উধাও তো কাল তেল উধাও। অনেক বেশী দাম দিয়ে তেল মেলে তো চিনি উধাও। চিনি এলো তো কেরোসিন যোগাড় করে কার বাপের সাধ্যি। গোডাউনে মাল থাকতে নেই বলে খরিদ্দার ফিরিয়ে শয়তানীর আশ্রয় নিতে জীবন ঘৃণাবোধ করে। ন্যায্য লাভ রেখে খরিদ্দারকে মাল বিক্রি করাই দোকানদারের কাজ। কিন্তু যে দামে জীবন মাল বেচে সেদামে মোকাম থেকে কিনতে পারে না। অনেক বেশী দাম দিতে হলেও অনেক কম টাকায় মেমো পায়। অনেক দিন রাগ করে মাল না কিনে টাকা ফেরৎ নিয়ে জীবনকে ফিরে আসতে হয়েছে। কিন্তু এদিকে দোকান থেকে খরিদ্দার ফেরে। নানা লোকে নানা কথা বলে।

—দাদা সানলাইট সাবান আছে?

—না, নেই।

—নেই না ছাই। দাম বাড়বে বলে সরিয়ে রেখেছে। শালা ওস্তাদ পেড্রোর বাবা।

ওস্তাদ পেড্র আবার কে! জীবন কপাল কুঁচ্‌কায়। পেড্র কোন্ একটা হিন্দী ছবির নায়ক। কর্মচারীর কাছে জীবন জানতে পারে। রাগে জীবন ছট্‌ফট করতে থাকে। যেন খাঁচায় বন্দী বাঘ।

—জীবনদা, গ্ল্যাক্‌সো আছে?

—না ভাই, ফুরিয়ে গেছে।

—আরে আপনিও বাঙাল দোকানদারের মত ঝামেলা করতে শিখ্‌ছেন।

জীবন দাঁতে দাঁত চাপে।

—বাঙাল-ঘটি বুঝি না। আমরা দোকানদাররা সবাই এক জাত।

—রেগে গেছেন দেখছি। যাক্, যা দাম হয় নিন। জিনিসটা দিন। খুব দরকার।

—বল্‌লাম তো আমার কাছে নেই।

—কদিন আগে ঐ দোকানটা থেকে ব্ল্যাকে পনেরো টাকায় এক কৌটো কিনেছিলাম। আপনি না হয় কুড়ি টাকা নিন। ঐ দোকানদারটা বলল মালটা এখন আপনার দোকানেই আছে।

জীবন রাগ চাপতে চেষ্টা করে।

—পাঁচ টাকার জিনিসটা কুড়ি টাকায় বেচ্‌বো কেন! আরো দাম বাড়ুক তারপর বেচ্‌বো। এখন নেই।

সাধারণ মানুষের কথা জীবনকে আজকাল হতবাক করে। কথাবার্তা কেমন যেন এলোমেলো। কথায় না আছে সততা, না আছে ভদ্রতা। ব্যবহারে নম্রতা যেটা জীবনের মূলমন্ত্র, তার কথাতেও রুক্ষতা এসেছে। ধৈর্যের বাঁধে ফাটল ধরেছে। লোকে বলে এটা নাকি বোবার বোল ফোটার যুগ।

জীবন আজকাল তুতিনখানা খবরের কাগজ পড়ে। কালবাজারী, মুনাফাবাজ, অসৎ ব্যবসায়ীদের সরকার জব্দ করবেই। স্বাধীন দেশের স্বাধীন সরকার। চালাকি নয়। অসাধু ব্যবসায়ীদের জব্দ করতে সরকার কত সব আইনের পর আইন করছে। কত নতুন নতুন অফিস খুলছে। নানা অফিসের নানা বাবু প্রায়ই দোকানে এসে জীবনকে নতুন নতুন আইনের কথা জানিয়ে যায়। কখনো মুখে, কখনো ইংরাজীতে লিখে। মানে বুঝতে না পারলে জীবনকে ছুটতে হয় কোন বিদ্বান লোকের কাছে। নানা রকমের খাতা, ফাইল, কাগজপত্র ঠিক রাখতে জীবন আজকাল হিমসিম খায়। খাতাপত্রের ব্যাপারে তুজন আলাদা লোক রেখেও সবদিক সামাল দিতে পারে না। মালের ষ্টক অনেক কমিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছে। সাবেকি খরিদ্দাররা দোকানের অবস্থা দেখে চমকে ওঠে।

—দোকান তুলে দেবেন নাকি জীবন বাবু? আজকাল কেমন যেন খালি খালি দেখি?

জীবন ম্লান হাসে।

—কেমন করে ব্যবসা চালাই বলুন? মাল পাইতো মেমো পাই না মেমো পাইতো যে দাম দিই সে দামে পাই না। মহাজনদের সঙ্গে বেশী তর্কাতর্কি করলে মাল বেচতে চায় না। খাতায় ঠিকমত জমা খরচ করা যায় না। এখন দেখছি ইংরেজরাই ভাল ছিল।

এতবড় জিভ কেটে ফাইন খদ্দরের চুড়িহাতা পাঞ্জাবী পড়া ভদ্রলোক বলেন—ছি ছি জীবনবাবু, যা বলেছেন বলেছেন, ওসব কথা আর মুখে আনবেন না। আপনি যখন যেমন মাল কিনবেন তখন তেমন বেচবেন! খাতায় জমা খরচ করবার দরকার কি?

জীবন চমকে ওঠে। ভদ্রলোক বলছেন কি?

—তারপর অফিসার এসে ধরলে কি হবে? আজকাল যেসব আইন হচ্ছে!

হা হা। ভদ্রলোকের হাসিতে ব্যঙ্গ।

—আপনি হাসালেন জীবনবাবু। অফিসার এসে কি করবে! কিছু গুঁজে দেবেন, সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে। তারপর মালের দামের ওপর গুঁজে দেওয়া টাকা যোগ করে লাভ রেখে বেচবেন।

ভদ্রলোকের কথায় জীবন থ হয়ে যায়। এভাবে জিনিসের দাম বাড়লে সাধারণ মানুষ বাঁচবে কি করে! যে সব মানুষের ঘুষের পয়সা নেই, যাদের খেটে খেতে হয়, তাদের চল্‌বে কি করে! এরই নাম কি স্বাধীন ভারত। এই স্বাধীনতার জন্যেই কি এত মানুষ প্রাণ দিল! এত সোনার টুকরো ছেলে ফাঁসির দড়িতে গলা দিল। জীবন ভেবে কূল পায় না।

হঠাৎ ভদ্রলোক আবার চিৎকার করেন।

—আচ্ছা জীবনবাবু পার্টির দাদাদের সঙ্গে আপনার জানাশোনা নেই?

—তা একটু আধটু আছে। স্বাধীনতার আগে স্বদেশী দাদারা দু' এক টাকা চাঁদা নিয়ে যেতেন। তবে স্বাধীনতার পর ওনাদের আর পাত্তা দেখি না।

—তাতে কোন অসুবিধে হবে না। কোন অফিসার কিছু করলে পার্টির দাদাদের গিয়ে ধরবেন। একদম টাইট দিয়ে দেবে। এইতো ক'মাস আগের কথা। এক সিমেণ্ট ডিলারকে হাতে নাতে ধরলো এক অফিসার। ডিলারটা ব্ল্যাকে সিমেণ্ট বিক্রি করছিল। প্রথমে অল্প হলেও পরে ভাল টাকাই গুঁজতে চেয়েছিল ডিলারটা। কিন্তু ব্যাটার লোভ অশেষ। ঘুষ নাকি খায় না। ডিলারটার সব সিমেণ্ট সিজ করলো।

ভদ্রলোকের কথাগুলো জীবন গিলছিল।

—তারপর কি হ'ল?

ভদ্রলোক সিগারেট ধরান। দামী সিগারেট। সবটুকু দম উজাড় করে টান দেন। নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়েন।

—কি আবার হবে! ডিলারটা পার্টির দাদাদের ধরলো। দাদারা ব্যাটাকে ধাপধারা গোবিন্দপুরে ট্রান্সফার করিয়ে দিল। এবার ঠ্যালা বুঝুক। অনেক কম খরচে কাজ হাসিল হয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি করে উঠতে গিয়ে ভদ্রলোকের জামার বেশ কিছুটা অংশ ছিঁড়ে যায়—জীবনের দোকানের পুরাণ চেয়ারের হাতলে বেঁধে। জীবন বড় বেরসিক লোক। সুপার ফাইন খদ্দরের তৈরী পাঞ্জাবীর অতটা ছিঁড়ে গেল। জীবনের একটু আহা করাতো উচিত ছিল। ভদ্রলোক জীবনের ভালোর জন্যেই তো এতটা সময় ধরে এত কথা বললেন। কিন্তু জীবনের স্বভাবটাই যেন কেমন ধারা। কোন কথা যদি ওর পছন্দ না হয়, তা'লেই ও চুপ হয়ে যায়। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। দেখলে যে কোন লোকের রাগ ধরে। ব্যবসা করতে গেলে কাউকে চটানো যে উচিত নয়, এ সত্যটা জীবন কিছুতেই বুঝতে চায় না। ভাল হোক, মন্দ হোক, কাকে দিয়ে কখন যে কি কাজ বাগিয়ে নেওয়া যায়, জীবন যেন তার ধারই ধারে না।

কয়েক বছর ধরে রমলার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। কোন না কোন অসুখ লেগেই আছে। বড় ছেলে উৎপল এখন কলেজে পড়ে। একটা একটা করে কতগুলো বছর যে কেটে গেল, জীবন হয়তো তার হিসাবই রাখে না। অবশ্য এসব নিয়ে চিন্তা করার তার সময়ই বা কোথায়। পিসীর মৃত্যু, রমলার শক্ত শক্ত অসুখ, ছেলে মেয়ে মানুষ করা, কত ঝামেলার ঝড় যে জীবনের মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে, তা কেবল রমলাই জানে। এখন রমলার চিকিৎসার ব্যাপারে জীবন আর বিশেষ মাথা ঘামায় না। মায়ের চিকিৎসার সব ব্যবস্থা এখন উৎপলই করে। রমলার সুচিকিৎসার জন্যে উৎপল শহরের বড় বড় ডাক্তার অনেক দেখিয়েছে। কিন্তু রমলার শরীর ভালোর দিকে যাবার কোন লক্ষণই নেই। এইতো গত বছর উৎপল কলকাতার এক নামকরা ডাক্তারের কাছে রমলাকে নিয়ে গিয়েছিল। ডাক্তারবাবু কিছুকাল ধরে শহরের এক ওষুধের দোকানে বসেন। মাসে একদিন রুগী দেখেন। অনেকের অনেক দুরারোগ্য রোগ ডাক্তারবাবু ভাল করেছেন। অনেক সময় ধরে ডাক্তারবাবু নানাভাবে

রমলাকে পরীক্ষা করলেন। কিন্তু প্রেসক্রিপসনে ওষুধের চেয়ে উপদেশই দিলেন বেশী। রমলাকে শুধু ওষুধ খাইয়ে এখন আর বিশেষ ফল পাওয়া যাবে না। রমলার কিছুকাল বাইরে যাবার দরকার। তাও একই পরিবেশে বেশীদিন থাকা চলবে না। এক মাসের বেশী এক জায়গায় নয়। ছ'মাস পরে আবার রমলাকে আস্তে হবে ডাক্তারবাবুর কাছে।

রাতে বাড়ী ফিরে জীবন সব জান্তে পারে। ফর্দের মতন করে হরিদ্বার, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর জায়গার লিষ্ট তৈরী করে। উৎপল আর ছ' বছরের মেয়ে কমলাকে সঙ্গে নিয়ে রমলা চেঞ্জে যাবে। কত টাকা নিতে হবে, কিভাবে নিতে হবে, কিভাবে জীবন মাঝে মাঝে টাকা পাঠাবে, মুখস্ত পড়ার মত জীবন গড় গড় করে বলে যায়। জীবনের কথা শুনে এহেন দুর্বল শরীরেও রমলা চিৎকার করে হেসে ওঠে।

—আমি বাইরে গেলে সংসার দেখবে কে? সেই ভোরে উঠে তোমার স্নানের জল ধরে রাখা, বেশী তেলমশলা না দিয়ে তোমার পছন্দ মত রান্না করা। মোকাম যাবার সময় টাকা পয়সা গুছিয়ে দেওয়া, এমনকি মাল কেনাকাটার ফর্দ মান্থলী টিকিটও তোমার পকেটে পুরে দিতে হয়। যেটুকু না দেখতে পারি সেটুকুতেই তো গোলমাল বাঁধিয়ে বস। আমি না থাকলে তোমার এসব করবে কে শুনি?

—ওসব হরির মা করবে।

—হরির মায়ের কাজ তোমার পছন্দ হবে তো? তুমি মনে কর রাতদিনের লোক রাখলেই সব মিটে যায়, না?

—অতসব তোমায় চিন্তা করতে হবে না। কিছুদিন ঘুরে এসো তারপর দেখা যাবে। কিছুদিন তুমি না থাকলে আমার অসুবিধা হবে। কিন্তু তুমি মরে গেলে আমার কি হবে, ভেবে দেখ?

আসলে রমলা যে কি বলতে চায়, জীবন যেন তার কিছুই বোঝে না। অদ্ভুত মানুষ। বিরক্ত হলে রমলার গলার স্বরটা বেশ কড়া হয়ে যায়।

—তাছাড়া আগামী মাসে উৎপলের শেষ পরীক্ষা ; উৎপল কি করে যাবে শুনি ?

রমলা সাধারণতঃ রাগে না। কিন্তু রমলা রেগে গেছে বুঝলে জীবন একেবারেই চুপ হয়ে যায়। কোন্ ভাষায় কথা বলবে যেন খুঁজে পায় না। পায়ে পায়ে তাই এগিয়ে গিয়ে জীবন শরীরটাকে বিছানায় এলিয়ে দেয়। সুযোগ বুঝে রমলা জীবনের বুকের কাছে বসে। উৎপল যে ঘরে দাঁড়িয়ে রয়েছে রমলার সেদিকে যেন খেয়ালই নেই। কি হ'ল রমলার! রমলা কি পাগল হয়ে গেছে! রমলা পাগল হলেও জীবন তো হয়নি। সঙ্কোচে সে নিজেকে বেশ কিছুটা সরিয়ে নেয়। কিন্তু রমলা আরও বেশী সরে আসে। কুনুই-এর ওপর ভর দিয়ে হাত দুটো জীবনের মুখের দুপাশে রাখে। বুকটাকে ঝুলিয়ে দেয় জীবনের মুখের ওপর।

—সারা জীবনটা তুমি বাড়ী আর দোকান, দোকান আর বাড়ী করলে। আমাদের সুখী করতে একটা দিনও বিশ্রাম নিলে না। তুমি এখানে দোকান বাড়ী করবে, আর আমি উৎপলের সঙ্গে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াব! নতুন নতুন জিনিস দেখব! আমি শান্তি পাব? তুমি ভাবতে পারলে? বার বার তোমার ক্লান্ত মুখটা মনে পড়বে। মনে শান্তি পাব না। অসুখ শরীরে আরও অসুখ বাড়বে। তোমায় ছেড়ে সগ্‌গে গিয়েও আমি শান্তি পাব না।

জীবনের বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে দেয় রমলা। হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে। উৎপল ঘর ছেড়ে চলে যায়।

রমলার মাথায় হাত রেখে জীবন বলে—কেঁদ না। ছেলেমানুষি কোরো না। তোমাকে বাঁচার জন্যে চেঞ্জে যেতে হবে। আমাদের বাঁচার জন্যে আমাকে দোকান খুলতে হবে।

জীবনের বুকে বুক রেখে মুখ তুলে রমলা বলে—কয়েক মাস উৎপল দোকানটা চালিয়ে নিক না?

জীবন হাসে। রমলার দুই গালে হাত রাখে। চুমু দেয়।

—লক্ষীসোনা। উৎপলের সঙ্গে ঘুরে এসো।। দোকানদারীটা অত সহজ কাজ নয়। অল্প বয়সে কাঁচা পয়সার স্বাদ পেলে পড়াশুনার

ক্ষতি হয় বলে ওকে আমি কোনদিন দোকানদারী করতে দিইনি। একটু বিশ্রাম, একটু আরাম করতে গিয়ে কত ছেলে আর দোকান যে একসঙ্গে নষ্ট হয়েছে ; তা আমি নিজে চোখে দেখেছি। জ্বর হয়েছে, আমাশার ব্যথায় ছট্‌ফট্‌ করেছি, তবু মরতে মরতে দোকান খুলেছি। উৎপল পড়াশুনা শেষ করুক, তারপর আস্তে আস্তে দোকানদারী শেখাব।

—তা'লে দোকান কিছুদিন বন্ধ রেখে চল।

—অসম্ভব। বহু টাকা পাইকারী আর খুচরো খরিদ্দারদের কাছে বাকি দেওয়া রয়েছে। দোকান বন্ধ রাখলে একটি পয়সাও আর আদায় হবে না। খরিদ্দারগুলোও হাতছাড়া হয়ে যাবে। এমনিতেই তো কয়েকটা খরিদ্দার মোটা টাকা বাকি ফেলে এদিকে আর আসে না। মনে হয় অন্য জায়গা থেকে মাল তোলে।

—তাগাদা দাও না কেন? কর্মচারী পাঠাও না কেন?

—পাঠাই। ছুশো টাকা বাকি যার কাছে, দশদিন গেলে দশ টাকা ঠেকায়।

—ছোট লোক। কোর্টে কেস করে দিতে পার না? জেল খাটুক।

জীবন হাসে। শব্দ করে হাসে।

—কেস করলে হয়রানি হয়। টাকা আদায় হয় না। জিনিসে ভেজাল প্রমাণ হলে দোকানদারের জেল হয়, জরিমানা হয়। কিন্তু খরিদ্দারে বাকি টাকা না দিলে আইনের চুলচেরা বিচারের পর খরিদ্দারের সুবিধা মত পাওনা টাকার কিস্তি হয়। কিস্তি না দিলে আবার কেস। আবার কিস্তি। কিস্তিতে কিস্তিতে দোকানদারের মুখে খিস্তি আসে। বাবুরা বলে দোকানদাররা ছোটলোক ; অশিক্ষিত।

রমলা সোজা হয়ে বসে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে। প্রেসার কুকারটা যেন হুইসেল মারে।

—তা'লে তুমি দোকান কর। আমি বাড়ীতে শান্তিতে মরি।

—তা কেন! এ বছর না হয় উৎপল আগামী বছর ফাইনাল দেবে। তুমি ঘুরে এসো।

—যাব না। উৎপল এ বছরই পরীক্ষা দেবে। ও ব্যবসা করবে না। চাকরী করবে।

রমলা সোজা হয়ে দাঁড়ায়। মুখটাকে কঠিন করে।

বছর খানেক কেটেছে। রমলার শরীরের অবস্থা আরও খারাপ। গত কয়েকদিন ধরে একভাবে বৃষ্টি হয়েছে। আজ ভোরে বৃষ্টি থেমে রোদ উঠেছে। জীবনের দোকানে খরিদ্দারের চাপটাও তাই দারুণ বেশী। বহু গ্রাম থেকে নানা রকমের খরিদ্দার এসেছে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু দুপুরের দিকে হঠাৎ সেলট্যাক্স ইন্সপেক্টর এসে হাজির। জীবনকে ক্যাশমেমো খাতাপত্র দেখাতে হবে। ব্যস, বেচাকেনার বারটা। বেশ কিছু সময় ধরে ইন্সপেক্টর সাহেব খাতাপত্র দেখছেন। যতটা পারছে জীবন বোঝাবার চেষ্টা করছে। ছোট মেয়ে কমলা আসে। ছুটতে ছুটতে। হাঁপাতে হাঁপাতে।

—বাপী, তুমি শীগ্‌গির বাড়ী এসো। মা কেমন করছে। দাদা ডাক্তার এনেছে। তোমায় এখুনি আসতে বল্‌ল।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কথাগুলো বলেই কমলা আবার ছুট দেয়। কমলার চোখ মুখের অবস্থা দেখে জীবন ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

—স্যার, দয়া করে আগামীকাল আসুন। আমার স্ত্রী গুরুতর অসুস্থ। এখুনি বাড়ী যাওয়া দরকার।

ইন্সপেক্টর বাবুর মুখে মুচ্‌কি হাসি।

—ব্যবসা কতদিন করছেন ?

দোকান বন্ধের জন্যে জীবন মুখ কাচুমাচু করে। সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

—তা বছর চল্লিশ হবে স্যার।

—বুঝতে পেরেছি। তবে দেখুন, বাড়ীর থেকে ডাকতে আসা,

শরীর খারাপ লাগা, আপনাদের এসব প্ল্যান বড় পুরাণো হয়ে গেছে। নতুন কিছু আবিষ্কার করুন। নতুবা মেমো বদ্‌লানো, খাতা পাল্টানোর সুযোগ আর পাবেন না।

হো হো। ইন্সপেক্টর বাবুর ঘর ফাটানো অট্টহাসি।

এ ধরণের ব্যবহারের জন্যে জীবন মোটেই প্রস্তুত ছিল না। একটা শিক্ষিত মানুষ এমন নিষ্ঠুর হয় কি করে !

জীবন আবার নিজের জায়গায় বসে।

—যতক্ষণ খুশী খাতাপত্র দেখতে পারেন। তবে মনে রাখবেন ব্যবসাটা যান্ত্রিক গতি নয়। অল্প স্বল্প ভুলচুক থাকতে পারে। ভুলটা ইচ্ছাকৃত কি অনিচ্ছাকৃত সেটাও দেখবেন।

ইন্সপেক্টর বাবুর মুখটা খাতার দিকে। কিন্তু চোখে আগুনের হল্কা।

—অর্ডার করছেন নাকি ? চোরের মায়ের বড় গলা। আনট্যাক্টফুল ফেলো।

কথা বাড়াতে জীবনের আর প্রবৃত্তি নেই। চুপ করে বসে থাকাই এখন ভাল। মুখখানাকে অন্যদিকে ফিরিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে জীবন বসে থাকে। যাকে বলে গা জ্বালানো জীবন মার্কা নীরবতা।

গুণ্ডা। পাড়ার ছেলে। উৎপলের ছেলেবেলার বন্ধু। সেও রমলার গুরুতর অবস্থার খবর জানায়। অল্প বয়সে ওর দুরন্তপনার জন্যে বাপ-মা আদর করে ওকে ঐ নামে ডাকতেন। কিন্তু বড় হয়ে ওর ঐ নামটা যে এমন সার্থকতা পাবে তা তাঁরা হয়তো ভাবতেও পারেননি। হ্যা, গুণ্ডাকে ভয় করে না এমন লোক এ শহরে আছে বলে মনে হয় না। ওর চোখে চোখ পড়লে যে কোন মানুষেরই রক্ত হিম হয়ে যায়। গুণ্ডার রোষে পড়ে কত লোক্‌কে যে এ পৃথিবী ত্যাগ করতে হয়েছে তার অল্প কিছু হিসাব মেলে পুলিশের খাতায়। গুণ্ডা এখন যুব দলে নাম লিখিয়েছে। রাজনীতি করে। দলের প্রথম সারির যুব নেতা। এম, এল, এ, এম, পি, সবাই ওকে খুশী রেখে চলে। এমন কি পুলিশ অফিসাররাও ওকে চটাতে চায় না। কোন গুরুতর অপরাধে জড়িত

সন্দেহে ওকে ধরে আনলেও কোন অজানা কারণে পুলিশ ওকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। রিক্সা থেকে এক লাফে নেমে জীবনের দিকে তাকিয়ে গুণ্ডা বলে—কাকাবাবু, কাকীমার অবস্থা খুবই খারাপ। শীগ্‌গির বাড়ী যান।

বিনা কারণে গুণ্ডা কোথাও আসে না। গুণ্ডাকে দেখে জীবন চমকে ওঠে। মুখ গোমড়া করে।

—কমলাও এসে বলে গেছে। কিন্তু ইন্সপেক্টর সাহেব মানতে চাইলেন না। কি করে যাই বল?

গুণ্ডার চোখে আগুনের ঝলকানি।

—কি-ব্‌-বে, কি বল্‌লাম?

মুহূর্তের মধ্যে দু একটা কাগজ ওলট-পালট করে ইন্সপেক্টরবাবু দেঁতো হাসেন।

—বা, বাঃ! খাতাপত্র ঠিকই আছে। বেশ ভালই আছে। যান্‌, তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে যান।

ইন্সপেক্টরবাবু গুণ্ডার দিকে তাকান।

—লোকে সব আজে বাজে অভিযোগ করে, তাই আস্‌তে হয়।

—দাঁত কেলান।

গুণ্ডার ছোট্ট জবাব।

চোখের পলকে গুণ্ডা যে কোথায় মিলিয়ে গেল জীবন তার আর পাত্তাই পেল না। টাকা পয়সা যেমন ছিল তেমনি পড়ে রইল। কর্মচারী ডেকে কোন রকমে দোকানের তালাগুলো আট্‌কিয়ে জীবন পাগলের মত ছুট দেয় বাড়ীর দিকে। ঘাড় ঘুরিয়ে জীবন দেখে ইন্সপেক্টরবাবু তখনও দোকানের দিকে তাকিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

জীবন বাড়ী পৌঁছানোর কিছুক্ষণ আগে রমলা এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। আর পাঁচটা সধবার মত রমলাও চেয়েছিল স্বামীকে দেখতে—শেষবারের মত। ঘাড় ঘুরিয়ে, চোখের জল ফেলে, ইসারা করে কত বার সে স্বামীকে দেখতে চেয়েছে। স্বামীর হাতের শেষ জলটুকু—অমৃতের

মত। রমলার জীবনে সব পাওয়ার সেরা পাওয়া। সেটুকুও কপালে তার জুটল না।

*   *   *

জীবন বেশী কথা বলা কোনদিনই পছন্দ করে না। কিন্তু রমলা মারা যাবার পর সে যেন বোবা হয়ে যায়। সংসারের সব দায়িত্ব, এমনকি রমলার শ্রাদ্ধ শান্তির যাবতীয় দায়ও উৎপলের কাঁধে চাপিয়ে জীবন প্রতিদিন ঠিক সময়ে দোকান খোলে ; বন্ধ করে। দোকান খোলা বন্ধের সময় সূচীটা জীবন কিন্তু খুব বেশীদিন বজায় রাখতে পারেনি। ব্যবসা করতে জীবনের আর ভাল লাগে না। দিনের পর রাত হয়, রাত পোয়ালে দিন হয়। বেঁচে থাকার ব্যাপারে জীবনের কাছে এখন এইটুকুই খাঁটি। শরীরেও তার ভাঙন ধরেছে। শুকিয়ে অর্দ্ধেক হয়েছে। পরিশ্রমও আর করতে পারে না। মাঝে মাঝে চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করে। তাও পারে না।

সেদিন সন্ধ্যে লাগার একটু পরেই জীবন দোকান বন্ধ করে বাড়ী ফিরেছে। ঘন অন্ধকারে দালানের এক কোণে একা বসে কি যেন ভাবছে। কমলা আসে। মায়ের মত হাঁটু ছড়িয়ে জীবনের সামনে বসে।

—বাপী, তুমি কি ?

—কেন মা ?

—মা মরে গেল, সবাই কত কাঁদল, আর তুমি একদিনও কাঁদলে না। তোমার শুধু দোকান আর দোকান।

ধুনুরীর তুলো ধোনা জীবন আজ দোকানে বসে দেখেছে। কাছাকাছি কিছু দুষ্টু ছেলে শান্তিপুরের রাস থেকে আনা চড়বড়িগুলো একভাবে বাজিয়ে যাচ্ছে। জীবন স্থির দৃষ্টিতে তাকায় মেয়ের দিকে। বুক ফাটা কান্নায় মেয়েকে কোলে তুলে নেয়। জড়িয়ে ধরে।

—মা'রে, আমরা দোকানদার। আমাদের কাঁদতে নেই, হাসতেও নেই। আমাদের আনন্দ করতে নেই, দুঃখ করারও সময় নেই। আমাদের অসুস্থ হতে নেই, চেঞ্জে যেতে নেই, বিশ্রাম নিতে নেই, সত্যি হলেও সে কথা

বলার অধিকার নেই। আমাদের শুধু কাজ আর কাজ। সারাদিন কাজ। কত দূর দূর থেকে দরকারী মালপত্র আমরা সংগ্রহ করি। চাহিদা মত মানুষের হাতে তুলে দিই। কখনও লাভ পাই, কখনও পাই লোকসান। আর পাই গালিগালাজ, টিট্‌কারী, সারা সমাজের অবজ্ঞা আর অপমান।

চার

জীবন ব্যবসা তুলে দিয়েছে। মানে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছে। এ জীবনে সে শান্তি পেতে চায়। তাই তার এই বেপরোয়া ব্যবস্থা।

উৎপলের বিয়ে দিয়েছে দমদমে। কয়েকটা বিশেষ কাজে জীবনকে বেয়াই বাড়ী আসতে হয়। কাজ সেরে ও যায় পোস্তা বাজারে —পুরানো মহাজনদের সঙ্গে দেখা করতে। কাশীনাথ আগরওয়ালা। জীবনের সব থেকে প্রিয় মহাজন। ঘুরতে ঘুরতে জীবন আসে কাশীনাথের গদিতে। গঙ্গার ধারে ঘর। পেছনের জানলা দিয়ে গঙ্গার ঘূর্ণীগুলোও পরিষ্কার দেখা যায়। এখানে এসেই জীবন পা দিয়ে ফেলে জীবনের আর এক ঘূর্ণীতে।

জীবন যখন মফঃস্বল শহরের বেশ বড় ব্যবসায়ী, প্রতি হপ্তায় পোস্তা থেকে মোটা টাকার মাল তুলতো, এক বাঙালী মহাজন ছিল জীবনের ডালের মহাজন। বহুদিনের মহাজন। বাঙালী মহাজনের পাশে কাশীনাথ ডালের ঘর খোলে। কাশীনাথের ব্যবহারটা বড় মিষ্টি। পরিষ্কার বাঙ্‌লা বলে। জীবনকে ডাকে। বাধ্য হয়ে জীবন মাঝে মাঝে কাশীনাথের ঘর থেকে মাল তুলতো। কিন্তু পুরানো মহাজনও জীবনকে ছাড়ার পাত্র নয়।

—বাঙালী হয়ে আপনি ওর ঘর থেকে মাল তোলেন ?

—ডাকে যে ! কি করি বলুন ! তাছাড়া বাঙালী অবাঙালী নিয়ে কি হবে ! আমরাতো সবাই পরাধীন ভারতবাসী।

—তা না হয় বুঝলাম। লোকটা কেমন সেটাতো বুঝবেন! লোকটা একটা ডাঁহা চিটার।

পরচর্চা পরনিন্দা জীবন কোনদিনই পছন্দ করে না।

—হ'তে পারে। আমি জান্‌বো কি করে!

জীবনের গলার স্বরে বিরক্তি।

—আরে মশাই আপনি না জানুন, আমরা তো জানি। ঐ কাশীর বাবা ছিল রাজস্থানের একটা আধা শহরের রাজমিস্ত্রী। বাড়ীতে এক কাঁড়ি ছেলেপুলে। সংসারে দারুণ অভাব। ওর মামা ছিল পোস্তা বাজারে সরষের তেলের নামকরা দালাল। একদম ছেলে-বেলায় কাশী মামার সঙ্গে কলকাতায় চলে আসে। একটু বড় হ'লে মামার সঙ্গে ঘুরত আর দালালী শিখত। মামার হ'ল অসুখ আর ওর কপাল গেল খুলে। তু'তিনটে মহাজনের মোটা টাকা মেরে বে-পাত্তা হ'ল। এবার বুঝুন মামাটার অবস্থা!

—কলকাতায় আবার ফিরল কি করে?

—মশাই, বেহায়ার লাজলজ্জা থাকে নাকি? কয়েক বছর পরে ঘর নিয়ে দিব্যি ডালের মহাজন হয়ে গেল। মরে মরুক মামা মরুক।

—বাবু, কিছু মনে করবেন না। অনেকদিন আগে আমি শুনে-ছিলাম আপনিও নাকি ডাল মিলের টাকা মেরেছিলেন।

—আরে মশাই ডাল মিলের টাকা সবাই মারে। তাই বলে কি মামার সঙ্গে বেইমানী করেছি?

বাঙালী মহাজনের ধম্‌কানিতে জীবন চমকে ওঠে।

—কে কার সঙ্গে বেইমানী করছে কি করে জান্‌ব বলুন?

জীবন নিজেকে সাম্‌লে নেয়।

এরপর থেকে জীবন আরও বেশী করে মাল তুলত কাশীনাথের ঘর থেকে।

সেই কাশীনাথ অনেক দিন পরে জীবনকে দেখে হাতের কাছে যেন একতাল সোনা পেয়ে যায়। জীবনের মত একজন মানুষের দেখা পাবার

জন্যে কাশীনাথ যেন সারা তুনিয়া হাঁতড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। নিজের গদি:তে জীবনকে বসিয়ে কাশীনাথ ভাইপোকে মিঠাই, বাদশায়ী পান, ঠাণ্ডা ডাব আনার নির্দেশ দেয়।

জীবন হাসে। অস্বস্তির হাসি।

—আমি কিন্তু বাবু মাল তুলতে আসিনি!

—এটা কি কথা বল্‌লেন জীবনবাবু! এতদিন পরে মনে করে এসেছেন। এটা কি আমার কম বড় ভাগ্য! কিন্তু এ কেমন হয়েছে আপনার চেহারা। একেবারে চার ভাগের এক ভাগ হয়ে গেছেন! কি হয়েছে আপনার? কি করেন এখন?

—কিছু হয়নি। কিছু করি না।

কাশীনাথ যে কত গভীর জলের জিনিস জীবন তা ভাবতেই পারে না। তুজনে গল্প শুরু হয়। গল্প আর গল্প। দীর্ঘ সময় ধরে। উৎপল ব্যবসা করতে বা শিখতে রাজী হয়নি। বি. কম. পাশ করে চাকরী নিয়েছে। সরকারী চাকরী। বিয়েও হয়েছে উৎপলের। মেয়ে কমলা বৌদির সঙ্গে বেশ ভালই মানিয়ে নিয়েছে।

জীবনকে আজই ছাড়তে কাশীনাথ রাজী হয় না। গিরিশ পার্কের কাছে তার নতুন বাড়ীতে জীবনকে এক রাত থাক্‌তেই হবে। জীবন আপত্তি জানায়।

—ছেলে, বৌমা চিন্তা করবে। অন্য আর একদিন এসে থাকা যাবে।

—কোন খবর না পেলে চিন্তাত' করবেই। আমি লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি একটা চিঠি লিখে দিন।

কাশীনাথ যা চায় যেমন করে হোক তা সে আদায় করে নেয়।

সেরাতে জীবনকে কাশীনাথের বাড়ী থাকতেই হ'ল।

রমলা মারা যাবার কয়েক মাস আগে জীবন শুনেছিল—গিরিশ পার্কের কাছে কাশীনাথ একটা পুরানো বাড়ী কিনেছে। কিন্তু পুরানো বাড়ী আর প্রাসাদত' এক কথা নয়। কাশীনাথের বাড়ীতে ঢুকে জীবন প্রশ্ন করে—আপনার বাড়ী?

—এইত, এইটে !

—এত লোক ?

—সব ভাগে ভাগে ভাড়া দিয়েছি। আমি থাকি সবার ওপরে। চারতলায়।

ঘুরে ঘুরে জীবন বাড়ীটা দেখে।

—বাবু, ভাড়াটেদের মধ্যে বাঙালী পরিবার কটা ?

—একটাও না।

—সেকি ! বাঙালীদের ভাড়া দেননি কেন ?

—বাঙালী ভাড়াটেরা বড় ঝামেলাবাজ। সেলামীর টাকার রসিদ চায়। যে ভাড়া ঠিক হয় সেই ভাড়াতেই পাকা রসিদ চায়। বুঝলেন জীবনবাবু, আমার মত হচ্ছে আমার টাকায় তৈরী বাড়ীতে থাকতে হলে আমার কথামত চল্‌তে হবে। বাঙালী ভাড়াটেরা এসব বুঝতে চায় না।

জীবনের শোবার ব্যবস্থা হয় অতিথি ঘরে। নিজের ঘর ছেড়ে কাশীনাথও শয্যা নেয় জীবনের পাশের খাটে। কথায় কথায় কাশীনাথ বলে—জীবনবাবু, আপনি তো এখন কিছুই করেন না। আপনার মত লোক কিছু না করলে ক'দিন বাঁচবেন ? আপনি বরং আমার ব্যবসায়ে চলে আসুন। না, না, আপনাকে আমার কর্মচারী হতে বল্‌ছি না। অংশীদারও নয়। আপনি আমার হিসাবপত্র দেখবেন, খাতাপত্র লিখবেন, আর এই ঘরটায় থাকবেন। আপনাকে আমার বড় ভাল লাগে। দুজনে মিলে জীবনটা আনন্দে কাটানো যাবে। মাসে না হয় হাজার টাকা করে হাত খরচ নেবেন।

—বাড়ী গিয়ে বৌমাকে জিজ্ঞেস করে আপনাকে জানাব।

জীবনের চোখে ঘুম লেগেছে। গলার স্বর জড়িয়ে গেছে।

আজ ঘুম ভাঙ্‌তে জীবনের দেরী হয়েছে। এখনো ঘুম ভাঙ্‌ত কিনা সন্দেহ। অতবড় বাড়ীর এত লোক তাকে যেন ঠেলে তুলে দিয়েছে। বিছানা ছেড়ে বারান্দায় এসে জীবন অবাক। এ যেন একটা অন্য জগৎ।

কেউ স্তব পাঠ করছে। কেউবা প্রাণপণে চিৎকার করে রামচন্দ্রের নাম গান করছে, পাছে অত দূরের ভগবানটা শুনতে না পায়। এক বৃদ্ধা একটা শিশুকে সর্বশক্তি দিয়ে তেল মাখাচ্ছে। আদর করছে—মুঝে লাল, তু জল্‌দি বড়িয়া হো যা। বড়িয়া বালা শেঠজী বন্‌ যা।

আর এক বৃদ্ধ এক গাদা অল্প বয়সী ছেলেমেয়ে নিয়ে বই পড়ে গল্প শোনাচ্ছে—তাদের দেশে কত বড় বড় ব্যবসায়ী আছে। তাদের কটা গাড়ী আছে। কতগুলো বাড়ী আছে। কে কত তাড়াতাড়ি কোটিপতি হয়েছে।

জীবন মুচ্‌কি হাসে। সিঁড়ি বেয়ে ছাদে ওঠে। দাঁত মাজার সময় পায়চারী করার অভ্যাসটা ওর বহুদিনের। পাশের বাড়ীর ফ্ল্যাটে স্বামী-স্ত্রীতে তর্ক হচ্ছে। জীবন কান পাতে। মহিলাটি বল্‌ছে—আমি খোকাকে ল পড়াব। ও জজ হবে। তুমি এ ব্যাপারে একটি কথাও বল্‌বে না। আমার বাপের বাড়ীর সবার এতে মত আছে।

খোকার বাবা চিক্‌রে ওঠে।

—তুমি চুপ কর। এখন পয়সা ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ারদের। খোকা ডাক্তার হবে, নয়ত ইঞ্জিনীয়ার। জজের লাইনে উপরি কোথায়? তোমার বাপের বাড়ী দিয়েই দেখ না!

* * *

ছেলে, বৌমার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও জীবন একদিন চলে আসে কলকাতায় কাশীনাথের কাছে। জীবন, জীবন মুহুরী হয় সেদিন থেকেই। প্রথমেই কাশীনাথ অবশ্য জীবনকে পাকা খাতা লিখতে দেয়নি। তবে বছরখানেক যেতে না যেতে জীবনকেই নিতে হয় কাশীনাথের পাকা ব্যবসার সমস্ত ভার।

কাশীনাথের ব্যবসায় লেগে থাকতে জীবনের যে ভাল লাগত এমন নয়। প্রথম প্রথম প্রায়ই কাশীনাথকে বলে বাড়ী চলে আসত। কিন্তু বাড়ীতেও সে শান্তি পেত না। রমলার শত স্মৃতি গলা টিপে ধরত। কমলার দেখাশোনা করে আবার কলকাতায় পালিয়ে আসতে বাধ্য হত।

কমলার চালচলন কথাবার্তা জীবনের বেশ ভাল লাগে। ছোট বোনকে উৎপল মনের মত করে গড়ে তুল্‌তে চায়। কমলাকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করেছে। শহরের বড় বড় অফিসার, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ছেলেমেয়েরা এই স্কুলে পড়ে। এ স্কুলে পড়াতে মোটা টাকা খরচ। কিন্তু ছোট বোনকে গড়ে তুলতে উৎপল টাকার হিসাব কষেনি। জীবনও এসব ব্যাপারে কোনদিন নাক গলাতে যায়নি।

কমলার জন্মদিন। জীবন এসেছে। এসেছে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা। কমলা তাদের লাইন করে দাঁড় করিয়ে জীবনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়।

—বাপী, আমার বন্ধু আক্‌বর। আমার থেকে দু' ক্লাশ উঁচুতে পড়ে। এর নাম মাইকেল। আমার সঙ্গে পড়ে। এ কানাই ঠাকুর। আমার বান্ধবী শুক্লা। আয়েসা। মেরী।

বহুদিন পরে বাড়ীতে আজ জীবন প্রাণের স্পর্শ পেয়েছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নাচ, গান, আবৃত্তি প্রাণ ভ'রে উপভোগ করেছে। অনেকক্ষণ ধরে ওদের সঙ্গে গল্প করেছে। সারা বাড়ী, এমন কি রমলার সাজানো ঠাকুর ঘরও ওদের ঘুরিয়ে দেখিয়েছে।

কমলাকে ডেকে আয়েসা বলে—কমলা, ইউ আর ভেরি লাকি টু হ্যাভ সাচ এ সুইট এণ্ড ফ্রেণ্ডলি ড্যাডি।

—থ্যাঙ্কস ফর ইয়োর কমপ্লিমেণ্টস।

রমলা উত্তর দেয়।

রাতে পা ছড়িয়ে জীবনের সামনে বসে কমলা বলে—বাপী, তুমি ওদের মায়ের ঠাকুর ঘরে নিয়ে গেলে কেন? মা যদি আকাশ থেকে দেখে থাকে কত কষ্ট পাচ্ছে! ওরা কেউ মুসলমান, কেউ খৃষ্টান।

—সেকি কথা মা! ধর্ম তো ভগবানকে ডাকার রাস্তা মাত্র। যারা যেমন করে ভগবানকে ডাকতে ভালবাসে তারা তেমনি করে ডাকে। তাই বলে ভগবান কি আলাদা হতে পারে?

—তবে যে মায়ের মুখে গল্প শুনেছিলাম, আমার জন্মের আগে মুসলমানরা নাকি আমাদের দেখলেই কুচি কুচি করে কেটে ফেলত ?

—শুধু মুসলমানরা আমাদের কাটবে কেন ! আমরাও মুসলমানদের কেটেছি। আসলে কিছু বুদ্ধিমান শয়তান নিজেদের স্বার্থে মানুষে মানুষে দাঙ্গা বাঁধায়। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ মিলেমিশে শান্তিতে বাঁচতে চায়। তুমি যে নানা ধর্মের ছেলেমেয়েদের সাথে বন্ধুত্ব করেছ, জন্মদিনে তাদের নেমন্তন্ন করেছ, তার জন্যে আমি খুব খুশী। তুমি আমার সোনা মা।

কমলার এ হেন আকর্ষণও জীবনকে নিজের বাড়ীতে ধরে রাখতে পারে নি। কাজ পাগল জীবন আবার পালিয়ে আসে কলকাতায়।

সন্ধ্যের পর মাঝে মাঝে কাশীনাথ নেশা করে। মাঝে মাঝে মানে মাসে বড় জোর দু'তিন দিন। কিন্তু যে রাতে নেশা করে, ওর মাত্রা জ্ঞান থাকে না। বিলীতি মদ বোতলের পর বোতল কাবার করে যায়, যতক্ষণ না বেহুশ হয়। কারোর কোন কথা কানেই নেয় না। কেউ কোন উপদেশ দিতে এলে অসভ্য ভাষায় গালাগালি করে। একদিন গ্লাসে ঢেলে জীবনকেও একটু বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু প্রতিবাদ মেশান জীবনের তীব্র দৃষ্টি কাশীনাথকে সাবধান করে দেয়। এ নিয়ে কাশীনাথ আর কখনো জীবনকে বিরক্ত করার সাহস পায়নি।

এক রাতে হুইস্‌কি টেনে কাশীনাথ বলে—জীবনবাবু, আপনার অতবড় ব্যবসা নষ্ট করলেন কি করে ?

—নষ্ট করিনি তো, তুলে দিয়েছি। যতদিন যাচ্ছে, দোকানদারী ব্যবসাতে ঝামেলার পর ঝামেলা বাড়ছে। খাতাপত্র ঠিক রাখ। ফাইলপত্র ঠিক রাখ। কাগজ পত্র ঠিক রাখ। সব সময় আইনের সঙ্গে পাঞ্জা লড়। সবাইকে স্যার স্যার কর। সব সময় মাথা নীচু করে চল। সৎ দোকানদার কথাটা সাধারণ মানুষের কাছে মিথ্যে কথা হয়ে গেছে।

দেশের সব রকমের অভাবের জন্যে দোকানদাররাই দায়ী। সরকার, সংবাদ পত্র বহু যত্নে এ ধরণের প্রচার চালাচ্ছে। এদিকে নানা রকমের আইনের গুঁতো সামলে, দোকানের নানা খরচ যুগিয়ে, পুঁজি ঠিক রাখাই অসম্ভব। জানেন, দোকানদারীর শেষ কটা বছর অনেক টাকা লোকসান খেয়েছি। আপনাদের দেনা মেটাতে কিছু জমিজমাও বেঁচ্‌তে হয়েছে। শুধু আইন, আইন, আর আইন।

জীবনের চোখ দুটো জ্বলন্ত কয়লার টুকরো।

—বলেন কি জীবনবাবু! যত আইন হবে ব্যবসা তো তত ভাল হবে। আমরা চাচ্ছি আরও কড়া কড়া আইন হোক।

—আপনারা সাহেব বলে, স্যার বলে, হাতে পায়ে ধরে ব্যবসা চালাতে পারেন। কিন্তু আমি পারিনি।

কাশীনাথের দেহটা ফণা তোলা সাপের মত সোজা হয়ে ওঠে। গলায় ঝাঁকুনি মারে।

—বাদ দিন জীবনবাবু। কোন শালোর কখনো হাতে পায়ে ধরি না। চাঁদির জুতো মারি, ব্যবসা করি। আর স্যার বল্‌তে, সাহেব বল্‌তে দোষ কি! অফিসাররাইত' ভগবান।

স্বাধীনতার পর থেকে যে অফিসার শ্রেণীটাকে জীবন ঘৃণা করতে বাধ্য হয়েছে তারা কিনা ভগবান! কাশীনাথ বলে কি! জীবন প্রতিবাদ করে।

—কিন্তু যখন তখন দোকানে এসে আইনের কচ্‌কচি নিয়ে ওনারা বড় ঝামেলা করেন।

কাশীনাথ মুচ্‌কি হাসে।

—করবেই তো। ঝামেলা না করলে ব্যবসা কেউ তুলবে না। বরং কাঁড়ি কাঁড়ি লোক ব্যবসা বাড়াবে, ব্যবসায় নামবে। শালো যতসব টিক-টিকির বাচ্চা। এইসব টিকটিকির বাচ্চাগুলো ব্যবসার দারুণ ক্ষতি করে।

—কিন্তু ব্যবসা করার অধিকার তো সবারি থাকা উচিত!

—নিশ্চয়ই থাকবে। ছোট ব্যবসা করতে হবে। ছোট দোকানে অফিসার যায় না। কিন্তু বাড়াবাড়ি করলেই ঝামেলা হবে। ঝামেলায়

ঝামেলায় মাথা খারাপ করে দিতে হবে। বুঝলেন জীবনবাবু, আমাদের যে চেম্বার অব কমার্স আছে, তার বড় বড় নেতারা মন্ত্রীদের দিয়ে আরও কড়া কড়া আইন তৈরী করানোর চেষ্টা করছে। বড় ব্যবসাদার যত কম থাকবে ততই ব্যবসা ভাল হবে।

—কিন্তু অফিসারদের হাতে আরও ক্ষমতা গেলে, সামগ্রিকভাবে তাঁরা তো ব্যবসার ক্ষতিও করতে পারেন!

—আপনি মশাই হাসালেন। আচ্ছা দেখুন, ইংরেজ দুস্‌মনরা চলে যাবার পর এর মধ্যে কিছু কিছু ভাল আইন হয়েছে। তাতে কি জিনিস-পত্রের দাম কমেছে, না আমাদের ব্যবসা খারাপ হয়েছে।

হো, হো। কাশীনাথ হাসে।

এক চুমুকে কঁত কঁত করে আবার আধ গ্লাস পেটে পুরে নেয়। ওপরের ঠোঁটটাকে মুখের মধ্যে চুষে ধরে। নাকটাকে সিঁটকায়। বাঁ চোখটা টেপে। মুখটাকে বিকৃত করে। জড়ানো গলায় আবার বক্‌বকানি শুরু করে।

—কি যেন বলছিলেন জীবনবাবু, ব্যবসাতে ঝামেলা। ঝামেলা তো হবেই। আচ্ছা দেখুন, আপনি যখন ব্যবসা ছাড়লেন, তখনো বড় বাজারে কত বাঙালী মহাজন ছিল। কিন্তু মাত্র কটা বছর পর আজ কটা আছে? আমরা কিন্তু কাউকেই তাড়াইনি। শালোরা নিজেরাই চলে গেছে। শালোদের মোটা মোটা টাকার সেলামীর লোভ দেখানো হয়েছে, আর ঝামেলা করানো হয়েছে। ব্যস, কাজ হাসিল। শালোরা একটু ভেবে দেখলো না, ব্যাঙ্কে টাকার সুদ যে হারে বাড়বে, আইনের গুঁতোয় ব্যবসায় লাভের হার তার থেকে অনেক বেশী হারে বাড়বে।

জীবন মাতাল কাশীনাথকে নিয়ে আরও একটু মজা করতে চায়।

—এসব কথা আমাকে বলে লাভ কি বাবু! আমি তো এখন আপনার কর্মচারী।

কাশীনাথ এক লাফে জীবনের কাছে সরে আসে।

—জোড় হাত করছি, পায়ে পড়ছি জীবনবাবু। এমন কথা কখনো বলবেন না। ব্যবসায়ী কাশীনাথ যখন সবেমাত্র দাঁড়াতে চেষ্টা করছে, তখন আপনিই তাকে হাত ধরে হাঁট্তে সাহায্য করেছিলেন। আমি তাই জানি, আপনি আমার কোন ক্ষতি করতে পারেন না। আমি জানি, আপনি আমায় হিংসা করতে পারেন না। আমি জানি, আপনি সাচ্চা মানুষ।

মাতাল কাশীনাথ লুটিয়ে পড়ে জীবনের পায়ের ওপর।

আর একদিনের কথা। সেদিন ছিল রবিবার। প্রতি রবিবারের মত আজও জীবন বিকেলের মধ্যে গঙ্গার স্নান সেরে গড়গড়াতে টান জমাবার ব্যবস্থা করছে, টল্তে টল্তে অতিথি ঘরে আসে কাশীনাথ।

হাসি মুখে জীবন বলে—বাবু দেখছি আজ দিনে দিনেই তৈরী ?

—মেজ ব্যাটার আজ একটা নতুন ব্যবসা ঠিক করে দিলাম। মনটা বেশ খুশ্ লাগছিল। তাই দিনে দিনেই একটু চড়িয়ে নিলাম।

জীবন গড়গড়াতে বেশ কয়েকটা সুখটান দেয়।

—বড় ছেলেকে বাদ দিয়ে মেজকে ব্যবসা করে দিলেন কেন ?

—বড়টা একদম গবেট্। বিলকুল অপদার্থ। ঠিক করেছি ওটাকে ভাল ভাল মাষ্টার রেখে দু' তিনটে পাশ করিয়ে চাকরীতে দিয়ে দেব।

—আপনি বাবু নেশা করলে কি বলেন আর কি যে না বলেন, তার মানে বোঝাই মুস্কিল।

হো হো। মাতাল কাশীনাথ অট্টহাসে।

—দারুণ বলেছেন মাইরী জীবনবাবু! এই জন্যে একটু সময় পেলেই আমি আপনার কাছে চলে আসি। এত মিষ্টি আপনার কথাগুলো। শালো যেন রস্গোল্লা।

কাশীনাথ বোতলের মুখটা মুখের মধ্যে পুড়ে দেয়। কঁত কঁত করে বোতলটাকে প্রায় শূন্য করে। একটু হাঁপায়। গিলে করা গরদের পাঞ্জাবীতে ঢাকা ডান হাতটা কয়েক বার আল্তো করে বুলিয়ে নেয় দুই ঠোঁটের ওপর দিয়ে।

—আপনারা, মানে বাঙালীরা মনে করে ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, ম্যাজিস্ট্রেট হবার মত ছেলে শুধু তাদের ঘরেই জন্মায়। আর আমাদের ঘরে সব উল্লু জন্মায়। ধারণাটা পুরাপুরি ভুল। আসল কথা কি জানেন জীবনবাবু, আমাদের ঘরেও ডাক্তার, ম্যাজিস্ট্রেট হবার মত বুদ্ধিমান ছেলে জন্মায়। কিন্তু বিদ্যের বিষ তার পেটে খুব বেশী ঢোকার আগেই আমরা হয় তাকে বাপের সঙ্গে গদিতে বসাই, নতুবা ব্যবসাতে ঢোকাই। আমাদের ঘরের যে ছেলেগুলো বোকা, অপদার্থ, সেগুলোকেই যতদূর সম্ভব পড়াশুনা করিয়ে আমরা চাকরীতে পাঠাই। আর আপনাদের সমাজে ঠিক এর উল্টা। তাই হাঁদাগঙ্গা যে ছেলেটা কোথাও কোন চাকরী না পেয়ে বাধ্য হয়ে ব্যবসা করতে আসে, সে আমাদের ঘরের চালাক চতুর ছেলেটার সঙ্গে বুদ্ধির লড়ায়ে পাত্তাই পায় না।

—আপনার মেজ ব্যাটার বয়স কম। এত অল্প বয়সে পড়াশুনা ছেড়ে ব্যবসাতে ঢুকতে আপত্তি করল না ?

—মোটেই না। আমাদের ঘরের ছেলেরা ব্যবসায়ী হওয়া গৌরবের বলে মনে করে। এ ব্যাপারেও আপনাদের সঙ্গে আমাদের মিল নেই। ছেলেবেলা থেকে বাড়ীর বড়দের কাছে নানা রকমের গল্প শুনে, সাহিত্য পড়ে, সিনেমা থিয়েটার দেখে, খবরের কাগজ পড়ে, আপনাদের ঘরের ছেলেদের মনে ব্যবসা আর ব্যবসাদার সম্বন্ধে একটা বিশ্রী ধারণা জন্মায়। যার জন্যে আপনাদের ঘরের ছেলেরা ব্যবসা আর ব্যবসাদারদের ঘিন্না করতে শেখে। ছোট ভাবতে শেখে। আর এই কারণেই আপনাদের ঘরের শিক্ষিত ছেলেরা ব্যবসা করতে লজ্জা পায়।

কাশীনাথ বোতলের শেষটুকুও খালি করে। ব্যস্ত হয়ে জীবন বলে—আর খাবেন না বাবু। প্রায়ই তো আজকাল পেটে ব্যথা বলেন। এবার একটু ধর্ম-কর্মে মন দিন। বইপত্র পড়ুন। ওসব নেশা ছাড়ুন।

*　　*　　*

প্রতিদিন জীবন সকাল দশটার মধ্যে গদিতে চলে আসে। সেদিন এসেছিল আরও একটু তাড়াতাড়ি। লাল খাতার হলুদে পাতাটা

খুলে জীবন কি যেন দেখছিল গভীর মনযোগে। কিসের যেন হিসাব মেলাতে পারছিল না কিছুতেই। হুড়মুড় করে গদি ঘরে ঢোকে কাশীনাথের মেজ ছেলে রামলাল। গোঁফের রেখাটা সবেমাত্র দেখা দিয়েছে। থুত্‌নীর মাঝখান দিয়ে কয়েকটা দাড়ি বেরসিকের মত্ উঁকি দিচ্ছে। মুখে হাসিটুকু লেগেই আছে। দুগালে টোল খাবেই এতটুকু হাসলে। মোটর সাইকেল থেকে মাত্র কয়েক লাফে জীবনের মুখের কাছে এসে ফিস ফিস করে রামলাল বলে—জ্যাঠাবাবু, বাবু কোথায় ?

—আমি জানি না। আমার সঙ্গে এখনো দেখা হয়নি।

দৃষ্টিটা খাতার দিকে রেখে জীবন বলে।

রামলাল ঘরের চার দেওয়ালের ওপর দিয়ে অসহায় চাউনিগুলো দ্রুত একবার ঘুরিয়ে নেয়। ঠোঁট দুটো বিড় বিড় করে। দ্রুত কয়েকবার পায়চারি করে গদি ঘরের মধ্যে। কাশীনাথের বিরাট গাড়িটা ঘ্যাস করে থামে গদিঘরের সামনে। রামলাল ছুটে যায়। কি যেন বলে বাপের কানে কানে। ভ্রূ কুঁচ্‌কে ছেলের মুখের দিকে একপলক তাকিয়ে কাশীনাথ আল্‌তো টান দেয় রামলালের বাঁ হাতে। ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয় গদির ওপর কাঠের কুঠুরি ঘরে চলে আস্‌তে। কুঠুরি ঘরের এয়ার কুলারটা চালিয়ে দিয়ে চাপা গলায় কাশীনাথ বলে—কি খবর ?

রামলাল ফিস ফিস করে।

—তুমি যে অফিসের কথা কদিন আগে বলেছিলে, তার বড় সাহেবকে খাইয়েছি। সকালে বাড়ীতে গিয়ে। পাঁচ হাজার টাকা। বলেছে কাজ দেবে।

কাশীনাথ শিউরে ওঠে।

—বলিস্ কি ? খেলে ? কিন্তু এত টাকা দিলি ? প্রথমে কিছু অল্প করে দিলেই পারতিস।

রামলাল মুচ্‌কি হাসে। নিজের ওপর ওর গভীর আস্থা।

—ঐ অফিসে যে সব মহাজন কাজ করে তাদের লোকদের পয়সা

খাইয়ে জেনে নিয়েছি, বড় সাহেবের দক্ষিণার পরিমাণটা। সে অনুযায়ী বেশ একটু বেশীই দিয়ে দিলাম। প্রথম ঘায়ে ঘাল করে দেওয়াই ভাল।

কাশীনাথের ঠোঁটের কোণে হাসি ফোটে।

—অত টাকা কামাই করতে পারবিতো ?

—প্রথমবারে না পারি, পরের বারে পারবোই। টাকা পয়সা নিয়ে টেপাটেপি করতে গেলে কোনদিন হয়তো ও অফিসে ঢুকতেই পারতাম না। উল্টে সাহেবের কাছে ধমকানী খেতাম। একবার ঢুকি তারপর সব শালোকে আস্তে আস্তে ঠিক হাটিয়ে দেব।

কাশীনাথ ধপ করে একটা থাবা মারে রামলালের পিঠে।

—বহুত আচ্ছা বেটা !

*   *   *

কমলা এ বছর ক্লাশ নাইনের এ্যানুয়াল পরীক্ষা দিয়েছে। সবেমাত্র ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে। রঙ্ পেয়েছে মায়ের মত দুধে আল্‌তা। কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া এক মাথা চুল। টানা টানা চোখের নীচে ছোট্ট হাঁ-মুখের লাজুক মিষ্টি হাসি যে কোন বৃদ্ধের মনেও রঙ্ ধরাতে পারে। একবার কলকাতা দেখার স্বাদ কমলার অনেক দিনের। জীবন বাড়ী ফিরলে তো বিরক্ত করেই, তাছাড়া প্রায় প্রতি চিঠিতেই আবদারের খোঁচা মারে। জীবন কমলাকে কলকাতায় আন্‌তে চায় না। মেয়েকে কলকাতা দেখাতে আন্‌লে ট্রামে বাসে উঠতে হবে। কলকাতার ট্রাম বাস ! জীবন যমের মত ভয় করে। তবে এটাও বোঝে, এভাবে মেয়ের আবদার আর বেশীদিন আট্‌কে রাখা যাবে না। সেবার কলকাতা থেকে বাড়ী আসার সময় জীবন অনুমতি চায় কাশীনাথের কাছে।

—পাগ্‌লী মেয়ে। কলকাতা দেখতে চায়। ক'দিনের জন্যে অতিথি ঘরে আন্‌তে চাই।

—আপনার বেটি, আমার বেটি আলাদা নাকি ? যতদিন খুশী এনে রাখুন।

ফেরার পথে জীবন কমলাকে সঙ্গে নিয়ে আসে। অল্প সময়ের

মধ্যেই মফঃস্বলের এই লাজুক, নম্র, শান্ত মেয়েটি কাশীনাথ রাজত্বের ওপর তলা থেকে নীচের তলা পর্যন্ত দারুণ ব্যস্ততার সৃষ্টি করায়। কতজন আসে অতিথি ঘরে। আলাপ করার চেষ্টা করে কমলার সঙ্গে। বুঝতে পারে না কমলা অনেকের কথা। বাপের দিকে তাকায় জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে। জীবন আন্‌মনে গড়গড়া টানে। ভাবটা, যেমন এসেছ, এবার বোঝ। আর বিরক্ত করবে!

রামলাল এখন বিরাট ব্যবসায়ী। ব্যবসার চাপে সারাদিন খাবার নাইবার সময় পায় না। কিন্তু কমলা আসার পর থেকে এহেন রামলালও ঘরকুনো হয়েছে। ব্যবসার অবস্থা এখন নাকি খুব খারাপ। রামলাল তাই কিছুদিন সরে থাকতে চায়। ব্যবসায়ে দারুণ লোকসানের সম্ভাবনা রয়েছে। আকস্মিকভাবে রামলাল উপলব্ধি করেছে এ সত্যটা। রাতে অতিথি ঘরে রামলাল আসে।

—জ্যাঠাবাবু, এভাবে এ বয়সে বোনকে সঙ্গে নিয়ে ট্রামে বাসে চেপে কলকাতা ঘোরা আপনার মোটেই উচিত হচ্ছে না। আগামী কাল আমার নতুন গাড়িটা ডেলিভারি পাচ্ছি। আপনি যদি বলেন, পরশু দিন থেকে আমিই কমলাকে কলকাতা দেখিয়ে দিতে পারি।

রামলালের কথা তো নয় যেন বৈশাখের একছটা বৃষ্টি। জীবন বেঁচেছে। রামলাল বাঁচিয়েছে। হাসিমুখে জীবন বলে—তা নিয়ে যেও। তুমি তো আমার ছেলের মত। তবে সন্ধ্যের আগেই ফিরে এসো।

আলিপুর চিড়িয়াখানা কমলার দেখা হয়ে গেছে। বাপের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কমলা চিড়িয়াখানা দেখেছে সুদূর আকাশে ভাসমান শঙ্খ-চিলের মত। রামলাল তাই গাড়ি ছোটায় যাদুঘরের দিকে। গাড়ি ছুটছে কখনো জোরে কখনো ধীরে। কখনো থেমে যাচ্ছে আলোর ইঙ্গিতে। পথের দুধারে সুন্দর সুন্দর বাড়ীগুলো যেন আঁকা ছবি।

রঙ্ করার কি বাহার! অল্প জায়গার মধ্যে মনমাতানো করে তৈরী করার কি সুন্দর কায়দা। বাপের সঙ্গে বাসে চেপে এমন করে কলকাতা দেখা হয়নি। আজ সুযোগ মিলেছে। কমলার বড় বড় চোখ দুটো আরও বড় হয়েছে। চাউনি হয়েছে গভীর। গাড়ি চালাচ্ছে রামলাল। পাশের সীটে কমলা। যেন আধ ফোটা পদ্ম। বাঁকা চোখে রামলাল বার বার তাকায় কমলার দিকে। মেয়েটা স্বপ্ন দেখছে নাকি! নড়ছে নাতো! ঘুমিয়ে পড়েনিতো! না তাকিয়ে আছে। বাড়ী দেখ্ছে। আলাপ করতেই হবে।

—এই বাড়ীটা লছমিনারায়ণ ছবিলচাঁদের। খুব বড় ব্যবসায়ী। বম্বে, দিল্লী, এমন কি বিদেশেও ওনার ব্যবসা আছে। প্রতি সালে কম করে দশ কোটি টাকা কামায়। আপনি নাম শুনেছেন?

বাইরের দিকে তাকিয়ে কমলা ঘাড় নাড়ে।

—না।

ঘাড় নাড়লে ভারি ভাল লাগে তো মেয়েটাকে। দুলটা কেমন দুলে ওঠে। আলাপ করতেই হবে।

—ছবিলচাঁদজীর মেজ ছেলে আমার বন্ধু। কাল ওর কলকাতায় আসার কথা। এখন আমেরিকায় আছে ব্যবসার দরকারে।

গাড়িটা থেমে গেছে। ট্রাফিক জ্যাম। পাশে একটা ডবল ডেকার দাঁড়িয়ে। কমলা চম্‌কে ওঠে। চিড়িয়াখানা থেকে যাতায়াতের কথা মনে পড়ে। মান ইজ্জত রাখা যায় না।

আলাপ করতেই হবে।

—ঐ যে বাঁদিকের ঐ বাড়ীটা! সামনে বাগান। ফুলে ফুলে ঢাকা। ওটা আমার এক বন্ধু করেছে। সারা ভারতে ও পাঁচটা কারখানা বানিয়েছে। বহুত্ পয়সা কামিয়েছে। বাড়ীটা দেখবেন?

কমলা হাল্‌কা হাসে।

—আগে যাদুঘর।

কমলার গলার স্বরটা ভারি মিষ্টি। কেমন যেন ছন্দ মেশানো। আছুরে। গাড়ি ছুট্ছে। হাস্লে মেয়েটাকে ভারি সুন্দর লাগে। হিন্দী ছবির নায়িকাগুলো কোথায় লাগে এর কাছে। দাঁতগুলো ঠিক ছুধের মত। না না মুক্তর মত। হ্যা ঠিক মুক্তর মত।

আলাপ করতেই হবে।

ঘুরে ঘুরে কমলা যাত্নঘর দেখ্ছে। দাদার কাছে এই যাত্ন ঘরের কত গল্প শুনেছে ছেলেবেলা থেকে। খবরের কাগজে যাত্নঘরের কত খবর পড়েছে পরম আগ্রহে। সেই যাত্নঘর দেখার আজ সুযোগ এসেছে।

মেয়েটা বড় গম্ভীর। কথা কইতে চায় না। রামলাল কত কথা বল্ছে। মেয়েটা আন্মনে হাসে। অবশ্য কি ঝল্মলে হাসিটুকু! ঐ হাসিটুকু দেখার জন্যেই বার বার কথা বল্তে ইচ্ছে করে। আলাপ করতেই হবে।

—এটাকে মুমী বলে। চীনদেশ থেকে আমদানী। যাত্নঘর কোম্পানী দশ লাখ টাকা খরচ করে আমদানী করেছে।

কমলা হাসে। ছেলেটা পাগল নাকি! চীনদেশ। মুমী। দশ লাখ টাকা। বল্ছে কি! সব কিছু লেখা রয়েছে তো! পড়তে জানে না!

একটা অয়েল পেন্টিংয়ের সামনে এসে কমলা আর নড়তে চায় না। কত শত বছর কেটে গেছে তবু কি উজ্জ্বল! কি রঙে আঁকা! সে যুগে কোথায় পাওয়া গেল ঐ রঙ! কমলার মনে প্রশ্নের শেষ নেই।

—এ ধরণের ছবি আঁক্তে এখন লাখ টাকা নেবে।

রামলালের কথার শব্দে কমলার ধ্যান ভাঙে।

সন্ধ্যের কিছু আগে রামলাল কমলাকে নিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে আসে। সামনের খোলা মাঠটা কমলার ভারি ভাল লাগে। চারিদিকে মরশুমী ফুল। এখানে ওখানে রঙ-বেরঙের পোষাক পরে কত ছেলেমেয়ে। কমলা চারিদিকটা একঝলক দেখে নিয়ে ঘাসের ওপর বসে পড়ে। যাত্নঘরের নানা জিনিস কমলাকে যাত্ন করেছে। কতশত বছরের কত ঐতিহাসিক বস্তু। যুগে যুগে দেশ বিদেশের বিভিন্ন শিল্পীর

কত বিচিত্র সৃষ্টি। কমলার সমস্ত চেতনাকে ভাবসাগরে ডুবিয়ে দিয়েছে। রামলাল কাছে নেই। কোথায় গেছে কে জানে! হাঁটুর ওপর থুত্‌নী রেখে অবুজের মত সবুজ ঘাসের দিকে তাকিয়ে কমলা বসে থাকে। হঠাৎ রামলালের চিৎকারে কমলা চম্‌কে ওঠে। নানা রকমের মিষ্টিতে ভরা বিরাট একটা প্যাকেট রামলাল খুলে দিয়েছে কমলার সামনে।

—আপনাকে দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম, আপনার খিদে লেগেছে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন। সন্ধ্যের আগে ফিরতে হবে।

এতগুলো মিষ্টি তাড়াতাড়ি খেতে হবে! কমলা ভয় পায়। মহাবিপদ। মুখ তুলে রামলালকে কিছু বল্‌তে যায়। কিন্তু পারে না। নিজের হাতের প্যাকেট থেকে রামলাল তখন গপাগপ্‌ মিষ্টি খাচ্ছে। চোখ দুটো বড় বড়। মাঝে মাঝে কিছুটা মিষ্টি ঠেলে মুখের বাইরে বেরিয়ে আস্‌ছে। রামলাল আঙুল দিয়ে ঠেলে সেটুকু আবার মুখের মধ্যে গেদে দিচ্ছে। পাছে মাটিতে পড়ে লোকসান হয়। কমলা শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকে। হাসে। শরীরটা কেঁপে কেঁপে ওঠে। পিঠের ওপর থেকে শাড়িটা সরে যায়। ব্লাউজের চারিদিক দিয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ কনক চাঁপা ফুলের মত পিঠের দিকে অবাক চোখে রামলাল তাকিয়ে থাকে।

মিষ্টি খেতে হবে। একটা সন্দেশ ভেঙে ভেঙে কমলা মুখে দিচ্ছে। বাকি গুলোর কি হিল্লে করা যায় ভাবছে। বাতাসে ভেসে আসে রবীন্দ্র সংগীতের সুর—আমার এপথ তোমার পথের থেকে………। ভারি সুন্দর গাইছে তো ছেলেটা! সুরে কত দরদ। কি মিষ্টি গলা! কে ছেলেটা! গলাটা যেন চেনা চেনা! চারিদিকে তাকাতে তাকাতে কমলা আপন মনে গায়কের দিকে এগিয়ে চলে। চিৎকার করে ওঠে রামলাল।

—ছি ছি ওদিকে যাবেন না। ওরা গান বল্‌ছে আপনি ওদিকে যাবেন কেন? চলুন বাড়ী যাই। আমার কাছে আশা, রফির রেকর্ড আছে। আপনাকে শোনাব।

কমলা থম্‌কে দাঁড়ায়। রাত করে ফিরতে বাপী মানা করেছে। অতএব বিদায় ভিক্টোরিয়া।

কমলার নেমন্তন্ন। কাশীনাথের ঘরে। কমলা ফিরলে জীবন জানিয়ে দেয়। কাশীনাথের স্ত্রী নিজে এসে কমলাকে ডেকে নিয়ে যায়। দৈ-বড়া, মুগের লাড্ডু, গুঁজিয়া, অমৃতি, আরো কত রকমের মিষ্টি বাটী থালা বোঝাই করে কমলাকে খেতে দেয় পরম আদরে। এত মিষ্টি এখন খেতে হবে! কমলা আবার বিপদে পড়ে। কমলা কিছু বল্‌তে যায়। এগিয়ে আসে কাশীনাথ।

—লক্ষ্মীমা, খেয়ে নাও। আজ তাড়াতাড়িতে সব রকম মিষ্টি তোমার কাকীমা তৈয়ার করাতে পারে নি। কাল থেকে সব রকম মিষ্টি করিয়ে দেবে। আমরা রোজদিন এসবই খাই। কাল থেকে তুমিও খাবে। সকালে খাবে, রাতেও খাবে। তুমি যে জীবনবাবুর সঙ্গে হোটেলে খাও, আজই আমি সেটা জান্‌তে পেলাম।

কমলা মিষ্টি গেলে। জল খায়। কষ্ট পায়। কিন্তু খায়। অনেক কষ্টে পালিয়ে আসে জীবনের কাছে। বালিশে মাথা রেখে আতুরে গলায় বলে—বাপী, বাপীগো, তুমি সবাইকে বলে দিও আমাকে যেন কেউ নেমন্তন্ন না করে। যে ক'দিন আছি তুমি আর আমি হোটেলে খাব।

জীবন মুচ্‌কি হাসে। গড়গড়া টানে।

রামলাল ব্যবসা ছেড়ে জীবনের মেয়েকে নিয়ে কলকাতা ঘুরছে। কাশীনাথ একথা আজই স্ত্রীর কাছে জান্‌তে পেরেছে। বিরক্ত হয়েছে। বলা যায় না কি থেকে কি হয়! এ ব্যাপারে রামলালকে কিছু বলাও উচিত হবে না।

—মেয়েটাকে নেমন্তন্ন কর।

কাশীনাথ স্ত্রীকে বুদ্ধি দেয়।

কলকাতা দেখা শেষ হবার আগেই বাড়ী থেকে চিঠি আসে—উৎপলের স্ত্রী অসুস্থ। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কমলাকে পাঠিয়ে দিতে হবে।

শেয়ালদা ষ্টেশন। সকালের দিক। ভিড় কম। কমলাকে নিয়ে জীবন বাড়ী ফিরছে। রামলালও এসেছে বিদায় জানাতে। জীবনকে নয়, কমলাকে। ট্রেনটা লেট আছে। টুকিটাকি কিছু কিনতে জীবন বাইরে যায়। রামলাল কথা বলে।

—কি খাবে?

—কিছু না।

—কেন?

—এইত খেয়ে এলাম।

রামলাল একটু থেমে থাকে। কিন্তু কাজের কাজটা সারতেই হবে।

—এখানে খুব ভাল কফি তৈরী করে। কফি খাবে?

—না। আপনি বরং খেয়ে আসুন। আমি জিনিস পত্র দেখছি।

রামলাল হতাশ হয়। মৌমাছি যেন হুল ফোটায় নাকের ডগায় কিম্বা চোখের পাতায়। কমলা উদাসীন। রেল লাইনের দিকে তাকিয়ে থাকে। কলকাতায় অনেক কিছু দেখা হ'ল। বৌদিকে সব গুছিয়ে বল্‌তে হবে। ইলেকট্রিক ট্রেনটা প্রচণ্ড শব্দে হর্ণ দেয়। কমলা চম্‌কে ওঠে। পাশে বসা রামলালকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে হাত দুটো আবার সরিয়ে নেয়। লজ্জায় মুখখানা রাঙা হয়ে যায়।

—ভয় পেলে?

রামলাল হাসে।

—না। চম্‌কে গেছি। আচম্‌কা এত জোর শব্দ করল! ভারি অসভ্য।

—কে?

—ট্রেনটা।

—ট্রেনটা?

হা হা। রামলাল হাসে।

—জানিনা।

বাঁকা চোখে কমলা তাকায় রামলালের দিকে। পাগল করা চাউনি।

কমলার দেহটা ভারি নরম। তুলোর মত। না, মাখনের মত। রামলাল আর সইতে পারে না। ফোলিও ব্যাগ থেকে কার্ড বের করে। কমলার হাতে গুঁজে দেয়।

—চিঠি দিও। আমার অফিসের ঠিকানা। টেলিফোন নাম্বারও আছে।

—পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকবো। সময় হবে না। এটা রেখে দিন।

কমলার হাতের কাঁচের কালো চুড়িগুলো ঝন্‌ঝনিয়ে ওঠে।

রামলাল অপ্রস্তুত। আহত। তবু মুখে হাসি টানে।

—ঐটুকুত জিনিস। বেশী জায়গাও নেবে না, ওজনও বেশী নয়। রেখে দাও। যদি কোনদিন কাজে লাগে!

ভেনিটি ব্যাগ খুলে তাড়াতাড়ি কার্ডটা রেখে দেয় কমলা। বাপী যদি এসে পড়ে! যদি দেখে ফেলে!

কমলা আবার নির্বিকার। কমলার এই নির্বিকার ভাবটা রামলালের বড় অসহ্য। কিইবা ওর বয়স! কিন্তু ভাবসাব যেন কোন কলেজের দিদিমনি কিম্বা কোন মেয়ে স্কুলের হেডমিষ্ট্রেস। এই বয়সি মেয়েরা কত ছট্‌ফটে হয়। কত কথা কয়। কমলা যেন কেমন ধরা! শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের কথা মনে পড়লে বিরক্তিতে রামলালের মন ভরে যায়। বেড়াতে বেড়াতে ওরা গঙ্গার ধারে এসেছিল। একটা সাদা পাল তোলা নৌকা ঢেউয়ের তালে তালে তুল্‌কি চালে চলছিল। কি সুন্দর! পায়ে পায়ে কমলা অনুসরণ করছিল নৌকাটাকে। একটা ভাঁটিয়ালি গানের সুর কমলার গলায় গুন্‌গুনিয়ে ওঠে। গান শুনে রামলাল গদগদ।

—বাঃ, বেশ গান বলেন তো! একটা রফির গান বলুন।

গান থেমে যায় সঙ্গে সঙ্গে। লোডশেডিং-এ টিভি।

—আমি গান জানি না।

কমলার আবার সেই নির্বিকার ভাব। আবার সেই রামলালের থেকে কয়েক পা এগিয়ে থেকে পথ চলা। চারিদিক হেংলার মত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা। গাছ, পাতা, ফুল, ফল, কমলা সবকিছু এমনভাবে দেখ্‌ছে

যেন কোনদিন কিছু দেখেনি। খালের ধারে ছোট্ট একটা রঙিন জংলা ফুল ফুটে রয়েছে। সাঁকোর ওপর থেকে ওটাকে বার বার দেখেও কমলার আশ্ মেটেনা। কাদা পাঁক ডিঙিয়ে যায় ওটার কাছে। ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। রামলাল বিরক্ত হয়। গা জ্বলে যায়। চিৎকার করে।

—দেরী হয়ে যাচ্ছে। ওটাকে ছিঁড়ে আমুন। বাজারে অনেক ভাল ভাল ফুল পাওয়া যায়। টাকা দেব। কিনে নেবেন।

তবুও রামলাল কমলার ওপর রাগতে পারে না। ওকে অবহেলা করতে পারে না। ঘাড় ঘুরিয়ে ওর না বলার ধরণটা, মাঝে মাঝে মুচ্কি হেসে দৃষ্টিটাকে অন্যদিকে মেলে ধরার কায়দাটা রামলালকে কেমন যেন যাছুর ফাঁদে ফেলে।

ট্রেন ছাড়লেই ছুনিয়ার যত ঘুম জীবনের চোখে ভিড় জমায়। বাপীটা এত ঘুমতেও পারে! ছুটো কথা বলার উপায় নেই। চুপ করে বসে থাকা যায়! কলকাতার কত কথা কমলার মনে পড়ছে। বাপীর মহাজনের ছেলে রামলাল। উঃ, কি বক্তে পারে! টাকা আর টাকা। ওর হৃদপিণ্ডটা মনে হয় টাকা দিয়ে তৈরী। ষ্টেশন অবধি ধাওয়া করেছে। কার্ডটা! কমলা চম্কে ওঠে। বৌদি যদি দেখে ফেলে! দাদা যদি জান্তে পারে! ছি! ব্যাগ থেকে ওটাকে তাড়াতাড়ি বের করে। জীবনের দিকে তাকায়। টুক করে জান্লা দিয়ে বাইরে গলিয়ে দেয়। ছুটন্ত ট্রেনের হাওয়ার টানে চাকা আর লাইনের চাপে ওটা দলা হয়ে যায়। যেন কিশোরী মেয়ের চিবিয়ে ফেলা আখের ছিবড়ে। কে বল্বে, ওটাতে অনেক লেখা ছাপা ছিল—হয়ত কিছু কথা।

কমলার সেবা যত্নে কদিনের মধ্যে উৎপলের স্ত্রী অনেকটা সুস্থ হয়। হ্যা অনেকটা সুস্থ। কারণ এই অবস্থায় সম্পুর্ণ সুস্থ হওয়া মেয়েদের পক্ষে সম্ভব নয়। বাড়ীতে নতুন আর একজন যে আস্ছে, এবার কলকাতায় যাবার সময় জীবন সে কথা জেনে গেছে।

* * *

প্রতিদিনের মত আজও জীবন ঠিক সময়ে গদিঘর খুলেছে। খাতাপত্র নিয়ে সবেমাত্র বসেছে। খাঁকি আর সাদা পোষাকে প্রচুর পুলিশ গদিঘর ঘিরে ফেলে। কাশীনাথের গদিঘর পুলিশ সার্চ করতে চায়। অনেক গুরুতর অভিযোগ আছে। মালিকের অনুপস্থিতিতে সার্চের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়ে জীবন কাশীনাথকে টেলিফোন করে। কাশীনাথ বাড়ীতে নেই। তাঁর ছেলে রামলাল আছে। সে আস্‌ছে। কাশীনাথের নির্দেশে জীবন এসব কথা পুলিশকে জানিয়ে দেয়। মহাজনের জন্যে জীবনকে মিথ্যে কথা বল্‌তে হ'ল। মাথা হেঁট করে জীবন বসে থাকে।

ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে। কিন্তু কোথায় রামলাল! পুলিশের বড় সাহেব চটে ফায়ার। বাজডাকা গলায় তিনি চিৎকার করেন।

—স্টার্ট দি সার্চিং।

বাঁধ ভাঙা জলের মত পুলিশ ঢোকে গদি ঘরে। জীবন আর আপত্তি জানায় না। বিমূঢ়ের মত হাতটা বাড়ায় টেলিফোনটার দিকে। কিন্তু একি! রামলাল না! কোথায় ছিল! কোথা থেকে এল এত তাড়াতাড়ি! তাহোক। জীবন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। রামলালের পরণে খদ্দরের ধুতি আর আধ ময়লা জামা। ওর এমন পোষাক জীবন কখনো দেখেনি। এত তাড়াতাড়ি জার্সিটা যোগাড়ই বা করল কোথা থেকে। শুধু কি তাই! চলাফেরায়, কথা বলায় যেন সে রামলালই নয়। ছুটে যায় রামলাল অফিসারের কাছে। হাত ধরে খাতির করে গদিঘরে টেনে আনে। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে।

—স্যাটাপ।

অফিসার চেঁচিয়ে ওঠেন। রামলাল ঘাবড়িয়ে যায়। গদি ঘরের সামনে প্রচুর লোকের ভিড় জমেছে। মুটিয়াদের সাটার টেনে দেবার নির্দেশ দিয়ে রামলাল আবার ছুটে যায় অফিসারের কাছে। জীবনের অসহ্য লাগে।

—মেজবাবু, তুমি বস দেখি! ওনারা সার্চ করছেন করুন না। আমরা চুরিও করিনি, ডাকাতিও নয়।

রামলাল মুখ বাঁকায়।

—আপনি চুপ করবেন ?

জীবন অবাক হয় রামলালের কথার ভঙ্গিতে। কিন্তু এখন অন্য কিছু ভাবার সময় নেই। গদি ঘরের টেলিফোন দুটো বেজেই চলেছে। বড় বড় মহাজনরা টেলিফোন করছে। আছে, চল্‌ছে, চেষ্টা করছে। এসব বলে জীবন টেলিফোন রাখছে। হঠাৎ সবাইকে চম্‌কে দিয়ে একটা কন্‌স্টেবল চিৎকার করে ওঠে।

—স্যার, পেয়েছি।

অফিসার সেদিকে ছুটে যেতে গেলেন। কিন্তু রামলাল এবার অফিসারের দুই পা জড়িয়ে ধরে।

—স্যার, এবারকার মত ছেড়ে দিন। আপনার পায়ে পড়ি। আমাদের সব চলে যাবে। আমরা ভিখারী হয়ে যাব।

এক ঝট্‌কায় পা দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে অফিসার বলেন—সব কৌটোগুলো বস্তা থেকে বাইরে আন। আমার সামনে থাক্ দাও।

পাশে দাঁড়ানো ছোট সাহেব বলেন—স্যার, একটা লরি ঠিক করার দরকার। এত বেবীফুড জীপে করে থানায় যাবে না।

—লরি একটা, কি কটা লাগে দেখুন ?

রামলাল কিন্তু অক্লান্ত। অনুরোধ, কাকুতি মিনতি, হাতে পায়ে ধরা একভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।

টেলিফোন এসেছে। জীবন রামলালকে ডাকে। কার সঙ্গে কি কথা হ'ল সেই জানে! কিন্তু রামলালের চোখে মুখে উৎকণ্ঠার আর চিহ্ন নেই। বেআইনী বেবীফুডগুলো গুনতি হচ্ছে। হোক! রামলাল নিশ্চিন্ত, নির্বিকার। বড় সাহেব নিজে লেখালেখি করছেন। করুন। রামলাল নির্বিকার। আবার টেলিফোন। এবার বড় সাহেবকে চাই।

—ও, ইয়েস স্যার। আচ্ছা স্যার।

সাহেব টেলিফোন ছেড়ে রামলালকে সাটার তুলে দেবার নির্দেশ দেন। রামলাল মুচ্‌কি হাসে। কন্‌স্টবলগুলো তখনও বেবীফুডের কৌটো

সাজিয়ে যাচ্ছে। গরমে ঘামে ক্লান্ত তারা। কিন্তু বিশ্রাম নেবার উপায় নেই। ডিউটি তাদের করতেই হবে। নির্দেশ তাদের মানতেই হবে। বিরাট একটা প্রাইভেট কার প্রচণ্ড শব্দে হর্ণ দিয়ে গদি ঘরের সামনে থামে। দামী গরদের গিলে করা পাঞ্জাবী পরা দুটো লোক গদি ঘরে ঢোকে। দেখলেই বোঝা যায় বেশ মালদার পার্টি। অফিসারের হাতে একটা কাগজের টুকরো গুঁজে দিয়ে তারা গদিতে বসে। গদি ঘরের সামনে তখনও কৌতূহলী মানুষের ভিড়। ভিড় দেখে লোক দুটো হাসে। ওদের মুখে কথার ফুলঝুরি।

—এসব মাল এখুনি সিজ হয়ে যাবে।

—এসব ব্যবসায়ীর শাস্তি হওয়াই উচিৎ।

—সব মাল বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। ভিড় কাটান। যে যার কাজে যান।

মালগুলো আবার চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গুন্‌তি হয়। চার হাজার আট্‌শো সাঁইত্রিশ। মাল সিজ হয়। সাক্ষী হয় বড় প্রাইভেট কারের ভদ্রলোক দু'জন। জীবন কোথাও কোন সহি দিতে রাজী না হলেও অফিসার জীবনের জিম্মায় বেবীফুডগুলো রেখে যান। রামলালকে জীপে বসিয়ে সাহেব জীপ ছুটিয়ে দেন। লোকে ভাবে পুলিশ কাশীনাথকে না পেয়ে রামলালকে গ্রেপ্তার করল।

সন্ধ্যের আগেই জীবন আজ অতিথি ঘরে ফিরেছে। টল্‌তে টল্‌তে কাশীনাথ আসে।

—কি জীবনবাবু, কি বুঝলেন? আপনাকে বলেছিলাম না, কোন শালোর হাতে পায়ে ধরে ব্যবসা করি না। চাঁদির জুতো মারি, ব্যবসা করি। কাল গিয়ে গদি ঘরে দেখবেন, সব মাল হাওয়া।

—সেকি বাবু! অফিসার মালগুলো আমার জিম্মায় রেখে গেছেন। বিপদে পড়ে যাব যে!

—কোন চিন্তা নেই। আইনের চোখে মুখের কথার কোন মূল্যই

নেই। সাধারণ লোক আইনের এত সব বোঝে নাকি! এই দেখুন, অফিসারের নিজের হাতে লেখা চোতাটা।

—তা বটে!

জীবন দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

—একটা কথা বলি বাবু। এটা কিন্তু মহা পাপ কাজ। দেশের শিশুরা খাদ্য পাচ্ছে না, আর আপনি তাদের খাদ্যগুলো এভাবে লুকিয়ে রেখেছিলেন! আমি তো ভাবতেই পারি নি।

হো হো। কাশীনাথ হাসে।

—আপনি হাসালেন জীবনবাবু। পাপ-পুণ্য, ধর্ম-আদর্শ, সত্য-ন্যায়, এসব মন্দির, স্কুল, কলেজের জন্যে ভাল কথা। ব্যবসাদারের এসব কথা শোনাও অপরাধ। ব্যবসাদার সুযোগ পেলেই পয়সা কামাবে। তাতে দেশের কি ক্ষতি হবে, দেশের মানুষের কি ক্ষতি হবে, সেসব ফালতু ভাবনা। ব্যবসাদার ওসব ভাববে কেন! বছর বছর লাখ লাখ, কোটি কোটি টাকা পুঁজি বাড়াতে হবে। যে কোন উপায়েই হোক পুঁজি বাড়াতে হবে। তবে তো মন্ত্রী, অফিসার সবাই আমায় শেঠজী ব'লে খাতির করবে!

হো হো। হা হা।

বেশ কয়েক মাস ধরে কাশীনাথের মেজাজটা বড় খিট্‌খিটে হয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই আজকাল নেশা করে। এত সহজে এত বেশী পয়সা রোজগার করলে মানুষের স্বভাব হয়তো এরকমই হয়। জীবনের ভাবনা-চিন্তা সব কিছুর হিসাব কোষতে চায়। ক'বছর তো জীবন কাশীনাথের কাজে যোগ দিয়েছে। এর মধ্যেই কাশীনাথ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় যে কত সম্পত্তি কিনেছে তা জীবন ছাড়া আর জানে কাশীনাথের ভাইপো। ভাইপো কাশীনাথের কারবার দেখে। আর যে কি করে এতদিনেও জীবন তা জানতে পারেনি। এইতো

ক'বছর হলো রামলাল ব্যবসায়ে নেমেছে। এরই মধ্যে সেও মোটা টাকা পুঁজি বাড়িয়েছে। রামলালের প্রশংসা করতে গিয়ে ভাইপো একদিন অনেক কথা জীবনকে বলে ফেলে। জীবন যে পাকা খাতা লেখে তাতে কোন কারচুপির প্রশ্রয় দেয় না। কাশীনাথও তা চায় না। জীবন বেইমানী না করুক, কাশীনাথ সেটাই চায়। কিন্তু কাশীনাথের সম্পদ বৃদ্ধি! আয় অনুযায়ী মোটেই নয়। জীবন ভাবে। রহস্য বটে! রহস্য যদি কাজ ছেড়ে বাড়ী চলে যাও। ওঃ, ধর্মপুত্তর যুধিষ্ঠির। ধরা গেল দেশশুদ্ধ জীবন শর্মা জীবন মুহুরী হয়ে গেল। যুধিষ্ঠির হয়ে গেল। তাহলেই কি সারাদেশে কাশীনাথ তৈরীর কারখানাটা বন্ধ হয়ে যাবে। বহু যত্নে, সাবধানে ঝানু ঝানু ওস্তাদ দিয়ে তৈরী ও' কারখানা। ঐ কারখানার অনেক যন্ত্রাংশ আবার বিদেশ থেকে আমদানি। কত জটিল সব যন্ত্রপাতি। প্যাচান তারে তারে বোঝাই। সেগুলো আবার দেশ দরদীর রাঙ দিয়ে ঝালাই। সমাজ সেবার রঙে পালিশ করা মাল। কাশীনাথ তৈরীর কারখানা দিনে দিনে বাড়ছে। বাড়বে। কোথাও লার্জ স্কেলে, কোথাও স্মল স্কেলে, কোথাও আবার আদর করে নাম দেওয়া হয় কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রি। ভাইপোগুলো ভাল। ভাল লুব্রিক্যাণ্ট। যেখানে যেমন সেখানে তেমন। কিন্তু জীবন শর্মা মানে জীবন মুহুরীরা! মাঝে মাঝে হুল ফোটায়। কাঁকড়া বিছের হুল! যন্ত্রণায় ছটফট। কিছুক্ষণ। তারপর আবার সব ঠিক ঠাক! তখন ফাঁক ফুটোগুলো বন্ধ করার কাজ আরম্ভ হয় অনেক সাবধানে। নিরীহ ফোকরবাসীদের প্রাণ তখন যায় যায়। জীবন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। খাতা লিখতে কলম ধরে।

উৎপলের ছেলের মুখ দেখতে জীবন বাড়ী এসেছে। বংশের প্রথম সন্তান যেদিন জন্ম নেয় সেদিনই উৎপল টেলিগ্রাফ করে জীবনকে জানিয়েছিল। কিন্তু জীবন তখন কলকাতায় ছিল না। কাশীনাথের একটা বিশেষ কাজে বাইরে ছিল। প্রায় এক মাস পরে কলকাতায়

ফিরে বাড়ীর টেলিগ্রাফ চিঠি পত্র দেখে জীবনের খারাপ লাগে। এর মধ্যেই যে উৎপলের স্ত্রীর ছেলেপিলে হবে জীবনের সেটা বোঝা উচিত ছিল। বিশেষ করে কমলার শেষ চিঠিটা পড়ে জীবন ব্যথা পায়। কমলা লিখেছে—তুমি পরের হিসাব গভীর মনযোগে মিলিয়ে চলেছ। নিজের হিসাব হয় গুলিয়ে ফেলেছ, নতুবা ভুলে গেছ।

আজকাল জীবন বাড়ীতে এলেই রামলাল সঙ্গী হয়। মালিকের ছেলে, জীবন আপত্তি করতে পারে না। এমনও অনেকবার হয়েছে, রামলালকে ফাঁকি দিয়ে জীবনকে বাড়ী আসতে হয়েছে। উৎপলের ছেলের মুখ দেখে রামলাল কিন্তু বেশ দামী উপহার দিয়েছে। গলায় সোনার হার, হাতে বালা, ওপর হাতে কবচ, মাথায় টিক্‌লি। নাম দিয়েছে রঘুবীর। এ নামে কমলার আপত্তি। মুখ বাঁকায়।

—এটা আপনি কি নাম রেখেছেন? বড় হয়ে ও যুদ্ধ করবে নাকি? আমি নাম দিয়েছি বিশ্বস্রষ্টা। ওটাই ওর নাম থাকবে।

রামলাল উৎপলের দিকে তাকায়।

—দাদা আপনার বোনের কথা শুনুন। ও যে শব্দটা বল্‌ল; আমি সেটা কোন কালে শুনিনি। অতবড় নাম, সারা জীবনে কত বার লিখ্‌তে হবে। আপনাদের অনেক টাকার কালি খরচ হয়ে যাবে।

উৎপল, ওর স্ত্রী কমলার দিকে তাকায়। হাসে। হাসতে হাসতে লুটোপুটি। কমলা কিন্তু হাসেনি। গম্ভীর মুখে জীবনের পাশে বসে পড়ে।

আজ দুপুরের ট্রেনে জীবন কলকাতায় ফিরবে। সকালে টুকিটাকি বাজার সেরে জীবন ঝুল বারান্দায় বসে গড়গড়া টান্‌ছে। রামলাল পাশে বসে।

—জ্যাঠাবাবু, আপনাদের এই শহরটা যত দেখি ততই অবাক হই। এখানে যেমন দোকানদারগুলোর স্বাস্থ্য, তেমনি পথ চলতি মানুষগুলো। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো মনে হয় খেতে পায় না। প্রায় সবাই লিকলিকে।

—স্বাস্থ্য কি করে ভাল হবে মেজবাবু! স্বাস্থ্যের জন্যে চাই খাদ্য। খাদ্য খেতে হলে চাই পয়সা। সেই পয়সাটাই তোমরা অধিকাংশ আট্‌কে রেখেছ।

রামলাল একটা হাল্‌কা ঘুঁষি মারে নিজের হাঁটুর ওপর।

—আপনি কি যে বলেন জ্যাঠাবাবু! আমরা আর কটা পয়সা আট্‌কে রেখেছি!

—আমি কি শুধু তোমার আর তোমার বাবার কথাই বলছি! আমি বল্‌ছি সারা দেশের ধনীদের কথা। বৈষম্যের কথা।

জীবন গড়গড়া টানে। একদমে ও অনেকক্ষণ গড়গড়া টানতে পারে। জীবনের গড়গড়া টানার দম দেখে রামলাল অবাক হয়। জীবনের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভেতরের ঘর থেকে কমলা ঝাঁঝিয়ে ওঠে।

—তোমার মুখে ওসব কথা মানায় না বাপী। যাদের পয়সা আছে তুমিত তাদেরই সেবা করে যাচ্ছ। তুমি কি মনে কর আমরা কিছু বুঝি না!

—তুই মা যত লেখাপড়া শিখছিস; তোর কথাবার্তা যেন কেমন ধরা হচ্ছে! আমি না হয় বড়লোকের গোলামী করছি। কিন্তু ঐ যে জ্যান্ত মরা মানুষগুলো, ওরা কেন বলে না—আমাদের পাওনা আমাদের দিতে হবে। আমরাও ভারতবাসী। আমাদের বঞ্চিত করা চল্‌বে না। ওদের গলায় সে গর্জন শুনি না কেন?

—গর্জন করলে গুলির অভাব নেই, সেকি তোমার অজানা?

কমলা চোখ পাকায়।

বাপ মেয়ের ঝগড়া দেখে রামলাল অস্বস্তি বোধ করে। কৃত্রিম হাসির শব্দ তোলে।

—ব্যাস ব্যাস, বাপ মেয়ের ঝগড়া এখানেই শেষ। ঝগড়াঝাটি শুনলে পাড়ার লোক অন্য রকম মনে করতে পারে। তাছাড়া সাধারণ মানুষ কি করছে, না করছে, সে সব ভেবে আমাদের লাভ কি!

কমলা কাউকেই ছেড়ে কথা বলার মেয়ে নয়। কয়েক পা এগিয়ে আসে রামলালের দিকে।

—আপনি তো শুধু লাভ আর লোকসানই শিখেছেন।

রাগ্‌লে কমলার দুধে আল্‌তা মুখে আল্‌তার ভাগটা বেড়ে যায়। ভারি ভাল লাগে।

—আর একটা জিনিসও শিখেছি। তোমাকে রাগাতে শিখেছি।

হা হা। জীবন হাসে। রামলাল হাসে। ধুপ ধাপ পা ফেলে কমলা চলে যায়।

কাশীনাথের খিট্‌খিটে মেজাজটা এখন লাগাম ছাড়া। আজকাল জীবনকেও দু একটা ছুট কথা শোনাতে ছাড়ে না। কাশীনাথের ব্যবহারে জীবনও বিরক্ত। কিন্তু রাগ করতে পারে না। রাগ করলেই তো চলে না। টাকা পয়সার দিকটাও তো দেখতে হবে। প্রতিদিন যেভাবে জিনিসের দাম বাড়ছে, কলসীর জল গড়িয়ে খেলে আর ক'দিন চলবে!

উৎপল চাকরী করে। মাইনে পায়। কিন্তু শত হিসেব করেও মাইনের টাকায় পুরো এক মাস চালাতে পারে না। খরচ দিনে দিনে বাড়ছে। মাইনে যে হারে বাড়ে, জিনিসের দাম তার থেকে সব সময়ই লাফিয়ে চলে। ঘুষ খেলে অবশ্য হয়। কিন্তু সে পথের ত্রিসীমানায় ও যেতে চায় না। সেদিন খুব ভোরে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন উৎপলের কাছে। উনি একটা দরখাস্ত করেছিলেন। উৎপল তদন্ত করে যা মন্তব্য করবে তারই ওপর নির্ভর করছে ওনার ভাগ্য। উৎপল কয়েকটা মাত্র কথা লিখে দিলেই কাজটা হাসিল হয়ে যায়। কথাগুলো কি লিখতে হবে তাও উনি বলে দেন। উৎপলের ওপর ওয়ালার সঙ্গে আগেই নাকি ওনার কথা হয়ে গেছে। কচ্‌কচে দুটো একশো টাকার নোট ভদ্রলোক উৎপলের হাতে গুঁজে দেন।

—দাদা ম্যানেজ করতেই হবে। পরে আরও দেব।

ভদ্রলোক মানুষ চিন্‌তে ভুল করেছেন। উৎপল ঠিক দেশী মাল নয়। নোট ছুটোকে চার আঙুলের চাপে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ছুড়ে ফেলে ও গর্জে ওঠে।

—আপনার মত ভাই থাকলে আমি তাকে গুলি করে মারতাম। শয়তান। ঘুষ দেবার জায়গা পান না! বেরিয়ে যান আমার বাড়ী থেকে।

সাত সকালে উৎপলের চেঁচামেচিতে আশপাশের বাড়ী থেকে অনেকে ছুটে আসে। অবস্থা সুবিধার নয় বুঝে দ্রুত পায়ে ভদ্রলোক হাওয়া হয়ে যান।

কমলা এখনো পড়াশুনা করছে। কতদূর পড়াশুনা করবে তা সেই জানে। তবে মেয়েরা যত পড়বে বিয়ের সময় খরচের বহরটা যে ততই বাড়বে জীবন এটা বেশ ভালই বোঝে। বয়স থাকতে, শক্তি থাকতে জীবন তাই যতটা পারে উপার্জন করে নিতে চায়। যতদিন সে বাঁচবে কারোর ওপর নির্ভরশীল হতে রাজী নয়। নিজের দায়দায়িত্ব কারোর ওপর চাপাতেও রাজী নয়।

কিন্তু বজ্রপাত! হঠাৎ হয়। সব দেয় লণ্ডভণ্ড করে।

সেদিন জীবন গদি ঘরে এসে আপন মনে খাতা লিখছে। কে একজন ভি. আই. পি. আসবেন গদি ঘরে। কাশীনাথ তাই সেজে-গুজে অপেক্ষা করছে। সারাদিন বক্‌বক্ করছে মুটিয়াদের সঙ্গে—ঘর পরিষ্কার করা নিয়ে মা বোন তুলে গালাগালি করতেও কসুর করছে না। খরিদ্দারদের মাল বইলে কিম্বা লরি থেকে মাল খালাস করলে মুটিয়ারা পারিশ্রমিক পায়। মালিকদের ঘরে কাজ করলে কিন্তু একটি পয়সাও নয়। অথচ কিছু বলারও উপায় নেই। ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলে না খেয়ে মরতে হবে। তাই মালিক যা বল্‌ছে ওরা তাই করছে। তবু কাশী খিস্তি করেই যাচ্ছে। সব জিনিসের সীমা আছে। মানুষের সহ্যেরও

সীমা আছে। দারুণ গরম। প্রচণ্ড পরিশ্রম। লম্বা চওড়া মুটিয়াটা একটু বেপরওয়া হয়ে ওঠে। কাশীনাথ ওর বোন তুলে একটা ক্যুৎসিত গালা-গালি করে। মুটিয়াটা আর সইতে পারে না। ঝাঁঝিয়ে ওঠে।

—মুখ সামালকে বাত্ বাতাইয়ে জী!

আর যায় কোথায়! কাশীনাথ তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে। মুটিয়াটা মেজেতে বসে ছিটিয়ে পড়া কি একটা জিনিস গুছিয়ে তোলার চেষ্টা করছিল। কাশীনাথ ছুটে এসে জুতো শুদ্ধ কয়েকটা লাথি চালায় মুটিয়াটার দিকে। মারাত্মক একটা লাথিতে ওর কয়েকটা দাঁত ছিটকে যায়। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে। রক্তে লাল হয়ে যায় বেশ কিছুটা জায়গা। হায় রাম। মুটিয়াটা লুটিয়ে পড়ে। জীবনের এবার ধ্যান ভাঙে। এক লোটা জল ঢেলে জীবন দ্রুত ছুটে যায় মুটিয়াটার কাছে। কিন্তু কোথায় জল দেবে। আঘাতের গভীরতা দেখে চম্‌কে ওঠে। চেঁচামেচি, ডাকাডাকি করে গদি ঘরের বাইরে এসে। অনেক মুটিয়া ছুটে আসে। ছুটে আসে কিছু কর্মচারী। ধরাধরি করে অজ্ঞান আহত মুটিয়াটাকে নিয়ে যাওয়া হয় মেওয়া হাসপাতালে। জীবন ঘুরে দাঁড়ায় কাশীনাথের দিকে।

—একটা মানুষকে এভাবে আঘাত করতে পারলেন? আপনি মানুষ?

কাশীনাথের দম্ভ সীমা ছাড়া।

—বেশ করেছি মেরেছি। আমার মুখের ওপর যে কথা বল্‌বে তারই অবস্থা করবো ঐ রকম।

কিন্তু জীবনের গলার স্বর আরও উঁচু। আরও কড়া।

—রাখুন মশাই, আপনি নিজেকে ঠিক করুন। মনে রাখবেন পাপ করলেই প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

কাশীনাথ উন্মত্ত। কুৎসিত তার মুখের ভঙ্গি।

—ওসব কথা আমার ঘরের বাইরে গিয়ে বলুন। বেসরম কাঁহিকা।

পৈশাচিকতার বিরুদ্ধে জীবন চিরকাল আপোষহীন। তার কথাও আজ লাগাম ছাড়া। ডান হাতের তর্জনী তুলে সে বলে—বেসরম আমি না আপনি। আপনি ডেকেছিলেন তাই এসেছিলাম। আপনি বলেছিলেন তাই আপনার মত বর্বরের কাছে কাজ করেছিলাম। আপনি বিশ্বাস করেছিলেন তাই ছিলাম।

কাশীনাথের ঘর থেকে জীবন বেরিয়ে আসে। বহু মুটিয়া চোখেমুখে তীব্র প্রতিবাদের ছাপ নিয়ে তখনও দাঁড়িয়ে আছে গদি ঘরের সামনে। কৃতজ্ঞতা মেশান চাউনি নিয়ে অনেকেই জীবনের দিকে এগিয়ে আসে। রক্তে ভেজা ছেঁড়া কাপড়ের লাল টুকরোটা তখনও পড়ে রয়েছে ফুটপাথের এক পাশে। সেটা হাতে তুলে জীবন গর্জে ওঠে।

—এ লাল আরও লাল হবে। এ লালের হাত থেকে কারোর রেহাই নেই। তোমরা সবাই এক হও। স্বাধীন দেশে মানুষের মত বাঁচার পথ খোঁজ।

জীবন চলেছে ৮বি বাস স্টপের দিকে। নীরবে তাকে অনুসরণ করে অনেক মুটিয়া। এক জামা কাপড়ে আর পকেটে কয়েকটা মাত্র টাকা সম্বল করে জীবন কলকাতা থেকে বিদায় নেয়।

পাঁচ

কাশীনাথের কাছে জীবন আর ফিরে আসে নি। কাশীনাথের তাতে বয়ে গেছে। ভাত ছিটালে কাকের অভাব! তবে হ্যা; একটু সতর্ক থাকতে হবে। তা হোক। তাই বলে চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। বড় বেশী নায় দেওয়া হয়েগিয়েছিল। মাথায় উঠেছিল। শালো নিমকহারাম। মেয়েকে ভিড়িয়ে দেয় মালিকের ছেলের সঙ্গে। শালো শয়তান। অনেক আগেই তাড়ান উচিত ছিল। ছোটলোকের এতগুলো কথা শুনতে হ'ত

না। পাকা খাতা লেখা! কিছুদিন ভাইপোকে দিয়ে চালিয়ে নিতে হবে। এর মধ্যে সাবধানে কাউকে খুঁজে নিতে হবে। কাশীনাথ ধরাকে সরা ভাবে।

বেঁকে বসে রামলাল। কাঁচা বয়সের বুদ্ধিমান ছেলে। জীবন জ্যাঠাকে নিয়ে তার অনেক স্বপ্ন। সব বিফল হবে নাকি!

—বাবুজী, এভাবে জীবনবাবুকে তাড়ানো মনে হয় ভাল হ'ল না।

—ভাল হ'ল কি মন্দ হ'ল তোমার থেকে বেশী বুঝি। আমি তো তোমার মত পাঁকে পড়িনি। অনেক আগেই তাড়ানো উচিত ছিল। শালো বেইমান।

কাশীনাথের ইঙ্গিত রামলাল বোঝে। এও বোঝে, এটা মাথা গরমের সময় নয়। সেও কেউটের বাচ্চা। কাজ হাসিল করার ব্যাপারে সেও ওস্তাদ। ঠাণ্ডা মাথায় সে বলে—কিন্তু এই ক'বছরের মধ্যে আমরা কোথায় কত সম্পত্তি কিনেছি, জীবনবাবু তার অনেকটাই জানে।

কাশীনাথ ফুঁসে ওঠে। তাত্ পাওয়া দুধের মত।

—কুচ্ পরওয়া নেই। কেস সাজাতে সময় লাগে না। কেসে কেসে ওর মাথা খারাপ করে দেবো।

—তাতে আমাদের কি লাভ? তাছাড়া তোমার শরীর ভাল নয়।

—তা তোমাকে ভাবতে হবে না। নিজের কাজে মন দাও।

—জীবন বাবুর জিনিস পত্তরগুলো?

—শেষ দু মাসের মাইনেও নিয়ে যায়নি। ক'দিন যাক। শালো কুত্তার মত আস্‌বে।

—আসবে না।

—জরুর আস্‌বে।

* * *

কমলাকে ভোলা যায় না। রামলাল আজকাল বেশ গম্ভীর। 'সেই হাসিখুসি চটপটে ভাবটা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। ব্যবসাতেও আর মন লাগে না। সবকিছু একঘেঁয়ে। নীরস।

সাতদিন। দশদিন। পনেরো দিন কেটে গেছে। জীবন আসেনি।

কাশীনাথের লিভারের ব্যথাটা ক'দিন দারুণ বেড়েছে। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যায়। চিকিৎসা চল্‌ছে।

রামলালেরও যন্ত্রণা। এ যন্ত্রণার কোন ওষুধ নেই। সে বেপরওয়া হয়ে ওঠে।

—জীবনবাবু এল না। আস্‌বে না। পাওনা টাকাগুলো আর জিনিসপত্তরগুলো দিয়ে আসা উচিত। তুমি বল্‌লে আমার গাড়ি করে দিয়ে আসতে পারি। জীবনবাবুর ভাবসাব আমার ভাল লাগছে না।

রামলাল যেন পাকা অভিনেতা।

অসুখে কাশীনাথ শয্যাশায়ী। ময়ূরে ঠোক্‌রানো কেউটে।

—তোমার যাবার দরকার নেই। অন্য লোক ঠিক করবো।

রামলাল আপত্তি করে।

—অন্যলোক! আর একটা ভুল হবে। জীবনবাবুর মনের কথা সে জান্‌তে পারবে না। এখন উনি কি ভাবছেন, কতটা শত্রুতা উনি আমাদের বিরুদ্ধে করবেন, তাতে আমাদের কতটা ক্ষতি হতে পারে, মিষ্টি কথা দিয়ে অন্যলোক জীবনবাবুর মনের কথাগুলো টেনে টেনে বের করতে পারবে না।

আবার লিভারের সেই অসহ্য যন্ত্রণা। কাশীনাথ আর ভাবতে পারে না। যা করে করুক। যা হয় হোক। পেট টিপে কাত্‌রাতে থাকে।

—তবে কাল সকালে যাও সন্ধ্যের আগে ফিরে এসো। জীবনবাবুর বাড়ী কিছু খেও না।

রামলাল যখন জীবনের বাড়ী পৌঁছায় কমলা তখন কলেজে। রামলাল গাড়ি থেকে নেমে সোজা চলে আসে জীবনের কাছে। বাঙালী প্রথায় প্রণাম করে।

ব্যস্ত হয়ে জীবন রামলালকে জড়িয়ে ধরে। আদর করে পাশে বসায়।

—আহত মুটিয়াটার কোন খবর জান? সে ভাল আছে তো?

সেপ্‌টিক হয়ে মুটিয়াটার অবস্থা গুরুতর। সে কথা রামলাল ভালই জানে। ব্যাপারটা সে চেপে যায়। একমুখ হেসে বলে—সে সব কথা পরে হবে। বাবুজী আপনার পাওনা টাকাগুলো পাঠিয়ে দিয়েছে। আমার গাড়িতে তুলে আপনার জিনিসপত্র সব গুছিয়ে এনেছি। কোন জিনিস একটুও নষ্ট হতে দিইনি।

জীবনের চোখে মুখে রুক্ষতা। গলার স্বর নীরস।

—আমার জিনিসগুলো এনেছ বলে তোমাকে ধন্যবাদ মেজবাবু। জিনিসগুলো এখুনি আমি নামিয়ে নেবার ব্যবস্থা করছি। কিন্তু টাকা তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও। ও টাকা আমি স্পর্শ করতে পারব না।

ফাগুনের ঝর্ণা বয়ে চলে রামলালের গলায়।

—আমাকে আপনি তাড়িয়ে দিচ্ছেন জ্যাঠাবাবু?

—ছি ছি এসব কি বলছ? যতদিন খুশী থাক। কোন অসুবিধে হবে না। কিন্তু ও টাকা আমি নিতে পারব না।

রামলাল জানে গোড়া কেটে আগায় জল দিলে গাছ বাঁচে না। ন্যাকার মত বলে—জ্যাঠাবাবু আপনি চলে আসার পর বাবুজী অনেক কেঁদেছে। পরের দিনই আপনাকে ফিরিয়ে নিতে আমাকে এখানে আসতে বলেছিল। কিন্তু আমিই আসিনি। ভেবেছিলাম বাবুজীটা যেমন অসভ্য হয়েছে, তেমনি একটু শিক্ষা হোক।

জীবন দ্রুত মাথা নাড়ায়।

—নিজের বাপ সম্বন্ধে এ ধরণের কথা বলা পাপ মেজবাবু। তবে সেদিন তুমি না এসে ভালই করেছিলে। আমি আর কাজ করব না। অনেক দিন তো করলাম। এবার বিশ্রাম চাই।

সুযোগ বুঝে একশো টাকার নোটগুলো রামলাল জীবনের সামনে রাখে।

—তবে তো আপনার এখন অনেক টাকা চাই। এগুলো রাখুন, পরে আরো দিয়ে যাব। আপনার পরিশ্রমের পাওনাটা নিয়ে নিন জ্যাঠাবাবু। নইলে আমাদের অকল্যাণ হবে। আমাদের কোন ক্ষতি হোক এটা কি চান?

—আমার দ্বারা তোমাদের কোন ক্ষতি হতে পারে না। ঠিক আছে, টাকাটা তুমি কোন মঠে বা স্কুলে·········

কথাগুলো জীবন শেষ করতে পারে না। কমলা ছুটে এসে ছোঁ মেরে টাকাগুলো তুলে নেয়। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে। কমলার বড় বড় চোখ আরও বড় হয়েছে। নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে।

—সেই থেকে তুমি টাকা টাকা করছ। ভদ্রলোক কত দূর থেকে এসেছেন! জল খাবারের ব্যবস্থা করেছ? বৌদিও বাড়ীতে নেই। তোমাদের কি হয়েছে?

কমলার আচম্‌কা কাণ্ড জীবন রামলালকে নির্বাক করে। দুজনই কমলার দিকে তাকিয়ে থাকে।

রামলাল আসার একটু পরেই কমলা কলেজ থেকে ফেরে। জান্‌লার আড়ালে দাঁড়িয়ে ওদের সব কথা শোনে।

কমলা ছেঁড়া নোটগুলোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। জীবনের ঘর ছেড়ে নিজের ঘরের দিকে চলে যায়।

—এই যে বৌদি, কোথায় ছিলে তুমি?

উৎপলের স্ত্রী ফিস্‌ ফিস্‌ করে কমলার কানের কাছে।

কমলা ফিরে আসে জীবনের ঘরে। চোখে মুখে রাগের চিহ্ন নেই। কালবৈশাখীর পর পূর্ণিমার চাঁদ।

—রাগ করবেন না রামলালবাবু। বাপী কখনও কারুর ক্ষতি করে না, আপনাদেরও করবে না। আপনি বসুন, আপনার জন্যে খাবার করে আনি।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে কমলা আবার ঘুরে দাঁড়ায়। চুলের গোছাটাকে খোঁপা বানিয়ে বাঁকা চোখে তাকায় রামলালের দিকে। মুচ্‌কি হাসে।

—জল খাবার খেয়ে আপনার গাড়িতে করে নদীর ধারে বেড়াতে যাব। কি, নিয়ে যাবেন তো?

—হ্যা, নিশ্চয়ই নিয়ে যাব।

রাগ-লজ্জা-করুণা মিশ্রিত কমলার রূপ রামলালের ছুচোখ স্থির করে দেয়। এই ভুবন ভোলানো রূপ দেখার জন্যে ক'দিন ধরে রামলাল কত লড়াই করেছে। কত কষ্ট পেয়েছে। সেই কমলাকে নিয়ে নদীর ধারে বেড়াতে যাওয়া—রামলাল নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে।

সেদিন গভীর রাতে এক জামাকাপড়ে জীবনকে কলকাতা থেকে হঠাৎ বাড়ী ফিরতে দেখে বাড়ীর আর সবার মত কমলাও খুব অবাক হয়েছিল। তারপর সব সময় জীবনের একা একা থাকার চেষ্টা। অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য। ক্ষতবিক্ষত মানসিক অবস্থা। কমলা, উৎপল, গভীরভাবে লক্ষ্য করে। উৎপল গজগজ করে। চোখ দিয়ে তার আগুন ছোটে। কিন্তু জীবনকে তারা কিছুই বুঝতে দেয়নি। কোন প্রশ্ন করে বিরক্তও করেনি। পাছে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে লাগে। বরং জীবন যখন যা চেয়েছে, তাই করেছে। হুকুমে হাজির থেকেছে। সেবা দিয়ে, যত্ন দিয়ে, কমলা জীবনকে গৃহবন্দী করতে চেষ্টা করেছে। বাপী বাড়ী থাকলে কমলার কাছে পৃথিবীর রঙ্‌টাই অন্য রকম। দিনগুলো আনন্দে ভরপুর। জীবন চলে গেলে কমলা সবার মধ্যেও একা একা। কিছুটা অসহায়।

বাপী আর কলকাতায় যাবে না, কমলার কাছে এটাই আজ সব থেকে বড় সত্যি, আনন্দের। বাড়ীর ভেতরে কাপ প্লেটের ঠুংঠাং শব্দের সঙ্গে কমলার মিষ্টি গলার গান সারা বাড়ীতে ভেসে বেড়ায়। যে রামলালকে কমলা ছু'চোক্ষে দেখতে পারত না, হঠাৎ তার প্রতি এত কৃপা দেখে জীবনও কিছুটা অবাক।

কমলা রামলালকে নিয়ে নদীর ধারে বেড়াতে যায়। ওরা কি করল; ছু'জনের মধ্যে কি কথা হ'ল, এখানে সেসব বলা যাবে না। তবে কলকাতা ফেরার আগে জীবনেব সঙ্গে দেখা করে যাবে, এ রকম কথা দিয়েও রামলাল আর জীবনের বাড়ী ফেরেনি। সন্ধ্যের অনেক পরে কমলা

রিক্সা করে একা বাড়ী ফেরে। মেয়ের অবস্থা দেখে জীবনের মত মানুষের মনেও একটা বিশ্রী সন্দেহের সৃষ্টি হয়। কমলার উস্‌কো খুস্‌কো চুল। আলুথালু অবস্থা। জীবনের সারাদেহ থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে থাকে। কি জানি কি সর্বনাশ হ'য়ে গেল মেয়েটার। এই বয়সের মেয়েকে একটা জোয়ান ছেলের সঙ্গে একা একা ছেড়ে দেওয়া মোটেই উচিত হয়নি। মা মরা মেয়ে বলে জীবন কখনও মেয়েকে শাসন করেনি। বরং একচেটে আদর দিয়েছে। মেয়ে এখন বড় হয়েছে। কেমন করে জীবন শাসন করে! কি সুন্দর কুঁচিয়ে শাড়ী পড়ে কমলা বেরিয়েছিল। সেটাও কেমন আল্‌গা হয়ে গেছে। যেন কোন রকমে তাড়াতাড়ি করে শরীরের ওপর জড়িয়ে নিয়েছে। আঁটো-সাঁটো ব্লাউজ ব্রেসিয়ার বেশ ঢিলে হয়ে গেছে। পিঠের দিকে ব্লাউজের মাঝখান দিয়ে বেশ কিছুটা লম্বা হয়ে ছিঁড়ে ফাঁক হয়ে গেছে। ব্রেসিয়ারের হুক তুটো সেই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে নারী অঙ্গের বিশেষ জায়গার একটা নিখুঁত ছবি এঁকে দিয়েছে। পেছনের দিকে কোমরের ঠিক নীচে গোলমত কাদার দাগ। চোখে মুখে অস্থিরতা। চলাফেরাও স্বাভাবিক নয়। পা ফেলতে কষ্ট পাচ্ছে। জান্‌লার ফাঁক দিয়ে, দরজার আড়াল দিয়ে মেয়ের অবস্থা দেখে জীবনের তুঃশ্চিন্তার সীমা থাকে না। কমলার একি হ'ল! বৌমাটাই বা কি! এতদিন তো বৌমাই কমলাকে স্নেহে যত্নে মানুষ করেছে। জীবন না হয় মেয়েকে শাসন করতে পারে না। কিন্তু বৌমা তো পারে। আর উৎপল! বড় দাদা নয়! পারে না অসভ্য বাচাল বোনটাকে তু চারটে চড়-চাপড় কসিয়ে দিতে! সে কি! উৎপল হাসছে না! হ্যা, হাসছেই তো! বৌমাও হাস্‌ছে! হেসে ওরা গড়াগড়ি খাচ্ছে! ওরা কচি নয়। সব কিছু বোঝার বয়স হয়েছে। একটা মা মরা মেয়ের এ হেন সর্বনাশ দেখে ওরা এত খুশী! জীবনের ইচ্ছে করছে সব কটাকে ধরে এখুনি বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়। ওদের মনে রাখা উচিত, জীবন এখনো বেঁচে আছে। সেই এ বাড়ীর কর্তা। কিন্তু এসবের জন্যে তো জীবনই দায়ী। তার জন্যেই রামলালের মত একটা পাকা শয়তান শর্মা বাড়ীতে ঢোকার

সুযোগ পেয়েছে। সেটা না হয় জীবনের দোষ। কিন্তু একথাও ঠিক যে তার কয়েক বছরের অনুপস্থিতিতে বাড়ীটা একটা পাপের কারখানা হয়ে গেছে। কাশীনাথের কাছে কাজ করার প্রথম দিকে জীবন একদিন কাশীনাথের সঙ্গে কলকাতার এক বড় জ্যোতিষীর বাড়ী গিয়েছিল। কাশীনাথ জীবন প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে, জীবনের দিকে তাকিয়ে জ্যোতিষী ঠাকুর বলেছিলেন—ঘরে মেয়ে আছে। তার ভাগ্য ভাল নয়। তা ছাড়া আর সব মোটামুটি।

জীবন জ্যোতিষী-মতিষী বিশ্বাস করে না। তাই জ্যোতিষীর কথা নিয়ে মাথাও ঘামায়নি কোনদিন। কিন্তু এবার জীবনকে কড়া হতে হবে। সে এখনো বেঁচে আছে। এখনো সেই এ বাড়ীর কর্তা। কারোর কোন রকম বেয়াদপী সে আর বরদাস্ত করবে না। যতদিন না কমলার বিয়ে হচ্ছে, জীবন কমলাকে চোখে চোখে রাখবে।

ছয়

সারাদিনে জীবনের এখন অনেক অবসর। বিকেলে প্রায় প্রতিদিন বাল্যবন্ধু সহপাঠি ভূদেব আসে। সন্ধ্যে অবধি দুই বন্ধুর আড্ডাটা বেশ ভালই জমে। ভূদেবের বিদ্যে জীবনের মতই। দু-এক ক্লাশ বেশীও হতে পারে। বেশ অল্প বয়সে ভূদেবকে পৈত্রিক ব্যবসার হাল ধরতে হয়েছিল। শহর থেকে মাইল আষ্টেক দূরের গ্রামে ভূদেবদের পৈত্রিক বাড়ী। ওখানেই ওদের পুরুষানুক্রমিক পাট ভূষিমালের ব্যবসা।

ভূদেব শহরে বাড়ী কিনেছে একথা জীবন প্রথম জানতে পারে কলকাতা ত্যাগ করে আসার বছর দুই পরে। জীবন দেখা করে ভূদেবের সঙ্গে।

—ভূদেব তুইও তাহলে শহরবাসী হ'লি? গ্রামের পাট কি একেবারেই চুকিয়ে দিলি?

—না। সুখেন জমিজমা ব্যবসা পত্তর দেখবে। আমি আর সবাইকে নিয়ে চলে এলাম।

—ভাল করেছিস। তোদের গ্রামে যেতাম সে কি আজকের কথা!

—শেষ গিয়েছিলি বোধহয় বছর পঞ্চাশ আগে। শহরে এলে তোর দোকানে যেতাম। তাও তুলে দিলি!

—এ জীবনের কিছুই ভোলা যায় না, বল? সেই কাঁচা রাস্তা, কুঁড়ে ঘর, গরুর গাড়ি, পাল্কী, কি দারুণ তোদের গ্রামটা!

—নারে জীবন, আমাদের গ্রামের এখন আর সে অবস্থা নেই। গ্রামের বুক চিরে এখন পাকা রাস্তা। কত রকমের যানবাহন, কত রকমের লোকজন। কত পাকা বাড়ী হয়েছে, ইলেকট্রিক লাইট এসেছে। কোন কোন বাড়ীতে রেডিও কিনেছে। কলের গানে আর মন ভরে না। দু একটা সরকারী অফিস হয়েছে। পোষ্ট অফিস হয়েছে।

—বলিস কিরে! আমি যখন যেতাম আশপাশের পাঁচ সাতখানা গ্রাম ছেঁকে ফেল্‌লেও কোন চিকিৎসকের দেখা মিলত না। কত মানুষ যে বিনা চিকিৎসায় মরত!

—এখন গ্রামে হেল্‌থ সেণ্টার হয়েছে।

ভূদেব দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

—বাঃ বেশ। সেই ডাকাতির কথা তোর মনে পড়ে? আমি সে রাত্রে তোদের বাড়ীতে ছিলাম। তখন আমরা বোধহয় ফোর্থ ক্লাসে পড়ি, নারে?

—তা হবে।

—গ্রামের ধনী, দরিদ্র, হিন্দু, মুসলমান সবাই মিলে কি লড়াই লড়ল! তিনজন গ্রামবাসীর লাশ পড়ে গেল, তবু ডাকাতরা তোদের বাড়ীতে ঢুকতে পারল না। সে কথা মনে পড়লে আজও আমার গায়ে কাঁটা দেয়।

ভূদেব আবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

স্মৃতি মন্থন জীবনকে আজ পেয়ে বসেছে।

—সেই ভাঙাচোরা শতচ্ছিদ্র খড়ের চালের প্রাইমারী স্কুলটা আছে?

—সরকারী টাকায় সেটা এখন পাকা হয়েছে। বড় বড় আট দশখানা ঘর। কত টেবিল চেয়ার অফিস ঘর। শহর থেকে শিক্ষিত কত মাষ্টার। গত বছর থেকে জুনিয়ার হাই চালু হয়েছে। গাঁয়ের লোকের আশা আগামী দু এক বছরের মধ্যে ওটা এস. এফ. অবধি হয়ে যাবে।

—বাঃ! তোদের গ্রাম তো দেখছি এখন আধা শহর! এতই যখন সুযোগ সুবিধে, চোদ্দ পুরুষের গ্রাম ছেড়ে শহরে এলি কেন?

—সেটাই তো কথা! তুই সে কথা বলতে দিলি কৈ! গাঁয়ে আগে অনেক অসুবিধে ছিল বটে, কিন্তু শান্তি ছিল! সম্মান ছিল। লোকে কত ভয় করত আমাদের! এখন মুনিষগুলোও চোখ রাঙায়। হেলে, জেলে সবাই এখন নিজেদের রাজা ভাবে। পার্টির অত্যাচারে দাদনের ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হয়েছে। এক কাঠা ধান পেলে যারা সারাদিন মাঠে গরুর মত কাজ করত, এখন তারা সরকারী রেট দেখায়। গ্রামে মিটিং করে। আইন শৃঙ্খলার নামগন্ধ নেই, শান্তি থাকবে কোথা থেকে! শুধু আমি নইরে জীবন, আমার মত অনেকে এখন গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আস্‌ছে।

—যাক্, তুই এসেছিস ভালই হয়েছে। কলকাতা থেকে এসে এই দু বছর যে কিভাবে কেটেছে! মাঝে মাঝে দোকানদারদের পাকা খাতা দেখা আর চুপচাপ বসে থাকা। আমার বাড়ীতে আসিস্ গপ্প করা যাবে।

ভূদেব এখন শহরে থাকবে। জীবনের আর ভাবনা নেই। দুজনে আড্ডা মেরে জীবনের বাকি দিনগুলো ভালই কাটবে। কিন্তু তাই কি হয়! মানুষের চলার পথগুলো কি কোথাও সোজা থাকে। সহজ সরল থাকে! কোথাও একটু সোজা, তারপরই বাঁক নিয়েছে। বাঁকৃত বাঁক্ বিলকুল সমকোণে বাঁকা। পথ না চেনা মানুষ অন্ধকারে চল্‌তে গেলে দেহটা খায় ধাক্কা। ঠুকে যায় মাথাটা। কোথাও আবার গর্ত। কাদায় পাঁকে ভরা। লাফ মেরে পথ চল্‌তে হয়। ঠেকে শেখা, দেখে শেখা, চালাক লোকগুলো পথ ঠিক পার হয়ে যায়। পথ না চেনা লোকটা মুখ থুবড়ে পাঁকে পড়ে। লোকে বোকা বলে। টর্চের আলো হাতে কল্লিত-

কর্মা লোকটা হেসে মরে। কোথাও পথটা দারুণ সরু। খুব সাবধানে চলতে হয়। একদম হাঁটি হাঁটি পা পা। বড় বাড়ীর ঝুল বারান্দা থেকে ছুড়ে ছুড়ে ওচ্লা ফেলে রাস্তার বারো বাজিয়েছে। বেশ করেছে বারো বাজিয়েছে। ওচলাগুলো খাবে নাকি! সিঁড়ি দিয়ে নেমে অতটা গিয়ে ডাস্টবিনে ওচলা কে ফেল্বে! কেন ফেল্বে! সময়ের গাছ দেখেছ। কিন্তু রাস্তাটা যে সাধারণ মানুষের। ওসব জ্ঞান দেওয়া কথা রাখ। মুখ সামাল্কে বাত্। সাত ব্যাটার বাপ। ছি ছি ছি এ জায়গাটা এমন কেন? বিশ্রী গন্ধ। মুতেছে। লোকে কাপড় তুলে ফুলপ্যান্টের বোতাম খুলে মুতে মুতে রাস্তাটাকে থক্থকে করে দিয়েছে। এ রাস্তা দিয়ে যাবে যাও। না যাবে ফিরে যাও। অন্য পথ দেখ। কোন্ পথ দেখি! লোক যত বাড়ছে; নোংরা যে তত বাড়ছে। রক্তে ভেজা ন্যাকড়া, চট্চটে নিরোধ, পানের পীচ্, গয়াড়ের দলা কম কোন্ রাস্তায়!

আজকাল জীবনকে কিছু বেশী সময় পাকা খাতায় মন দিতে হয়। কিছু কিছু দোকানদার অফিসে পাকা খাতা জমা দেবার আগে গোপনে জীবনকে দেখিয়ে নেয়। দোকানদারদের মতে অধিকাংশ মুহুরীই আজকাল অসৎ। অফিসারদের সঙ্গে লাইন করে। ইচ্ছে করে পাকা খাতায় ক্রটি রাখে। স্বল্প শিক্ষিত কর্মব্যস্ত দোকানদারদের থেকে টাকা নেয়। অফিসারকে নাকি খাওয়াতে হয়। বিশ্বাসঘাতকতার এসব কাহিনী শুন্তে শুন্তে জীবনের কান ঝালাপালা। যার লবণ খাব; যার কাছে মাইনে নেব; তার সঙ্গেই বেইমানি করবো! জীবনের বিশ্বাস হতে চায় না। জীবন হয়তো দোকানদারদের এসব কথা অবিশ্বাসই করত, যদি খাতার মধ্যে এ ধরণের প্রমাণ সে সত্যিই না পেত। অনেকের পাকা খাতা জীবনকে পুরোপুরি পাল্টিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করতে হয়। আবার অনেকের খাতার বিশেষ বিশেষ জায়গার ছোটখাট ভুলক্রটি শুধ্রে নেবার নির্দেশ দেয়। কে পাকা খাতায় কারচুপি করছে, কে করছে না, এসব কচ্কচি নিয়ে জীবন আর মাথা ঘামায় না। এ ব্যাপারে দেশের

অবাস্তব আইনগুলোই দোকানদারকে অসৎ হতে বাধ্য করে। অন্তত জীবনের ধারণা তাই।

মাঝে মাঝে ভূদেবের অনুরোধে জীবনকে গ্রামের আড়তে যেতে হয়। সুখেন হিসাবপত্র ঠিক মত রাখছে কিনা জীবনকে দেখতে হয়। হিসাবের গরমিল দেখলে সুখেনকে সজাগ করে দেয়। সুখেন ভূদেবের বড় ছেলে।

এতটুকু অবসর পেলেই আড়তের সামনে রাস্তার ওপিটে ছোট মুদিখানার দোকানটার দিকে জীবন একভাবে তাকিয়ে থাকে। দোকানটা জীবনের খুবই চেনা। কতকাল কেটে গেছে। দেশের কত পরিবর্তন হয়েছে। দোকানটার কোনদিকেই যেন কিছুমাত্র খেয়াল নেই। পঞ্চাশ বছর আগে দোকানটা যেমন ছিল আজও ঠিক তেমনিই আছে। সেই তেলচিটে পরা পোড়া মাটির মাল্‌সা, কল্‌সী, ভাঁড়। সেই বহুবার আল্‌কাতরা মাখিয়ে বহু চেষ্টায় রক্ষা-করা টিনের কৌটোগুলোর মধ্যে অল্প অল্প জিনিস। আটচালা ঘরের বারান্দাটা বেড়া দিয়ে ঘিরে বেচাকেনা করার সেই ব্যবস্থা। সব একই রকম রয়েছে। ছোটবেলায় জীবন ভূদেবের সঙ্গে গ্রামে এসে ঐ দোকানের মালিকটাকে যেমন দেখেছিল আজও ঠিক যেন তেমনি। ভূদেবের বাবা আড়ত ছেড়ে বাড়ী গেলেই, ভূদেব কোন রাখাল ছেলেকে ডেকে ঐ দোকানটা থেকে এক পয়সায় ছটা বিড়ি কিনিয়ে আনত। দুটো বিড়ি রাখাল ছেলেকে দিতে হোত। বাকি চারটে দুই বন্ধুতে মিলে আড়তের পেছনে খুবড়িতে বসে ফুঁকতো। নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ার কায়দাটা জীবন প্রথম ভূদেবের কাছেই শেখে। ক'দিন আগে আড়তে বসে জীবন ঐ ঘটনার কথা তুলতেই ভূদেব জীবনের মুখ চেপে ধরেছিল। ছেলেরা সব বড় হয়েছে, কে কোথায় শুনবে! কেলেঙ্কারীর শেষ থাকবে না। জীবন এখন ঐ দোকানে যে যুবকটাকে বেচাকেনা করতে দেখে সে পঞ্চাশ বছর আগেকার লোকটার নাতী—

মন্মথ রায়। গাঁয়ের লোকে আদর করে ডাকে মানা বলে। মানাকে রাগাবার জন্যে কেউ কেউ মাঝে মাঝে মুনা বলেও ডাকে। রেগে গেলে মানা সাংঘাতিক। হাতের কাছে যা পায় তাই ছুড়তে থাকে।

ভূদেব আড়তে নেই। সুখেন জীবনকে বলে কোথায় বেরিয়ে গেছে। জীবন আজো তাকিয়ে আছে মানার মুদিখানাটার দিকে। কাঁকে একটা রোগা বাচ্চা নিয়ে কালমত বৌটা খরিদ্দারের চাহিদা মত পনেরো নয়ার সরষের তেল, পাঁচ নয়ার জিরে-ধনে আর তিন নয়ার লবণ বেচে। জীবন হাঁ করে সব লক্ষ্য করে। মাথায় কাপড় টেনে বৌটা ঘরে ঢোকে। মানা ঘর থেকে বেরিয়ে জীবনের দিকে তাকায়। জীবন হাত-ছানি দেয়।

—আমার বয়স যখন বছর চোদ্দ তখন ভূদেবের সাইকেলের পেছনে চেপে আমি প্রায়ই এখানে আসতাম। তোমাদের দোকানটা তখনো যেমন ছিল আজো তেমনি আছে। তখন যিনি দোকানদারী করতেন, তিনিও ছিলেন ঠিক তোমার মত। ভূদেবের কাছে শুনেছি তিনি তোমার ঠাকুরদা ছিলেন। কি করে মারা গেলেন ?

মানা দাঁড়িয়ে ছিল। হাঁটুগেড়ে বসে জীবনের পায়ের কাছে। জীবন আপত্তি করে। পাশে বসতে বলে। মানা রাজী হয় না।

—জানিনাতো বাবু। ঠাকুদ্দাকে কোন দিন দেখিনি।

—তোমার বাবা মারা গেলেন কবে ?

মানা হাসে।

—বাপ্ যখন মরে আমার তখন জ্ঞান হয় নি। মার মুখে শুনেছি, বাপ্ সগ্গে গেছে।

—মা আছেন ?

—না।

—কবে মারা গেলেন ?

—আমার রয়স তখন সাত বছর। নোকে বলে।

—এখন তোমার বয়স কত ?

মানা চুপ করে থাকে। বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে ডান হাতের গাঁট গুনতে চেষ্টা করে।

—বল্‌তে পারবনি বাবু। তবে পঁচিশ—পঁয়ত্রিশ হবে।

—বিয়ে করলে কবে ?

—যে সনে মুখ দিয়ে অক্ত উঠল, সেই সনে।

মানার সাফ জবাবে জীবন চমকে ওঠে। পা গুটিয়ে যুত করে বসে।

—সেকি ?

—হ্যা। মেয়েটা আমাদের ঘরের নয় বাবু। আদিবাসীদের। ভাব করে বিয়ে করেছিলাম।

মানার ঠোঁটের ফাঁকে লাজুক হাসি।

—মুখ দিয়ে রক্ত উঠল বিয়ের আগে বৌকে জানালে না ?

—জানিয়েছিলাম। বৌ বললে, আগে মালা বদল করেনি ; পরে শহরের ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করিয়ে সারিয়ে দেব। হক্ কথা কি জানেন বাবু, আমার ঠাকুদা, বাপ-মা, এক দাদা, ছোট বোন সবমাই টিবি ওগে মরে। আমিও মরতাম। বৌ সকালে জমিতে মুনিষ খেটে, আতে নোকের বাড়ী কাজ করে আমাকে বাঁচিয়েছে। ও আমার ঘরের নক্ষী।

—কত দিন সুস্থ হয়েছে ?

—যে সনে বড় বন্যে হ'ল, সেই সনে।

—তবে তো বেশ ক'বছর হ'ল। দোকানটাকে ভাল করনা কেন ?

—পুঁজি কোথা বাবু ? তবে এখন ফি হপ্তায় মোকাম যাই। বৌ সাইকেল কিনে দিয়েছে। পেছনে লবণের বস্তার ওপর একটিন তেল বেঁধে নিই। অডে রইল চালের বস্তা। দুই হ্যাণ্ডেলে চটের ব্যাগ বোঝাই করে কাঁইদানা, চায়না নজেন্স, নটারীর প্যাকেট, মশলাপাতি নিয়ে আসি।

—বর্ষাকালে অসুবিধে হয় না ?

—আগে খুব হোত বাবু। আমিও ভিজতাম, মালও ভিজে গোবর হোত। তবে এখন মালগুলো তেল কাগজে জড়িয়েনি। আমি ভিজলেও মালের ক্ষতি হয় না।

মাস দুই পরের কথা। জীবন এসেছে ভূদেবের আড়তে। মানার দোকানের সামনে দারুণ ভীড়। গাঁয়ের লোক মানার দোকানের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখছে। ব্যাপার কি! জীবন সুধায় সুখেনকে।

—ওখানে অত ভীড় কেন?

—শহর থেকে অফিসার এসেছে মানার দোকানে। মানা সরষের তেলে ভেজাল দেয়। গাঁয়ের লোকেরা নাকি অভিযোগ করেছে। অফিসার তেলের নমুনা নিয়ে পরীক্ষায় পাঠাবে। ভেজাল প্রমাণ হলে মানার জেল জরিমানা দুই হতে পারে। মানা মানার বৌ তাই হাতে পায়ে ধরছে। অফিসার ইংরাজীতে কি সব বল্‌ছে। মানা, মানার বৌ তার কিছুই বুঝ্‌ছে না। ওরা আবার হাতে পায়ে ধরছে। এই চলছে।

জীবন আসে মানার দোকানে।

—ব্যাপার কি স্যার! মানা কি করেছে?

—আর বলবেন না। রোজ রোজ সরষের তেলে ভেজাল দিয়ে বিক্রি করে। ওর বিরুদ্ধে গ্রামের লোকের অনেক অভিযোগ।

—তাই নাকি! আচ্ছা স্যার আজ শহরের পাইকারী বাজারে ষোল কেজি ওজনের আগ মার্কা গণেশ তেলের দাম কত? আর সুরেন মার্কা খাঁটি সরষের তেল, ভেজাল প্রমাণে এক হাজার টাকা পুরস্কার লেখা কাগজের লেবেল সাঁটা একটিন তেলের দাম কত?

জীবনের প্রশ্ন অফিসারের পছন্দ হয় না।

—আমার ওসব জানার দরকার নেই।

জীবন হাসে।

—কিন্তু আমি জানি। প্রতি টিনে প্রায় পঞ্চাশ টাকা ফারাক। যে সব কলে মিলে ভেজালের বন্যা বইছে, আপনারা সেখানে যান না।

এমন কি শহরে যে সব অসৎ হোলসেলার রাতের অন্ধকারে তেলের টিনের চাক্‌তি খুলে ভেজালের মধ্যে ভেজাল ঢালে, আপনারা সেখানেও যান না।

অথচ.........

জীবনের কথা শেষ হয় না। ভীড়ের মধ্যে থেকে কে যেন বলে ওঠে—সাহেবরা সেখানে যাবেন কেন? তাদের সঙ্গে ওনাদের যে মাসোহারার ব্যবস্থা আছে।

ভীড়ের মধ্যে হাসির ফোয়াড়া। অফিসারের চোখে আগুন। জীবনের দিকে তাকিয়ে সাহেব বলেন—আপনি কিন্তু সরকারী কাজে বাধার সৃষ্টি করছেন। বেশী বাড়াবাড়ি করলে আমি আপনার বিরুদ্ধেও থানায় জানাতে বাধ্য হব। কি নাম আপনার?

আড়ত থেকে ভূদেব ছুটে আসে। জীবনের হাত ধরে টান দেয়।

—আড়তে আয়। সুখেন ডাক্‌ছে।

জীবনকে যত্ন করে গদিতে বসিয়ে সুখেন বলে—কাকু, আমার কাছে কিছু না জেনে ধাঁ করে আপনার ওখানে যাওয়া উচিত হয়নি। ঐ অফিসার ভদ্রলোককে আমি চিনি। উনি স্বাস্থ্য দপ্তরের ইন্সপেক্টর। আমাদের আড়তের পেছনে যে সরকারী অফিস হয়েছে, উনি সেই অফিসের কেরাণী বাবুর বন্ধু। অনেক দিন আমি ওনাদের এক সঙ্গে দেখেছি।

—কে কার বন্ধু তাতে কি যায় আসে?

জীবন ঝাঁঝিয়ে ওঠে।

বড় বড় চোখ করে চাপা গলায় সুখেন বলে—না কাকু, আসল কথা সেটা নয়। ঐ কেরাণীবাবু মাস তিনেক আগে মানার দোকান থেকে একশো টাকার মত জিনিস ধার নিয়েছিল। মানা টাকাটা চাইলে প্রতি মাসেই বলে, মাইনে পেয়ে দিয়ে দেবে। অথচ প্রতি মাসে মাইনের টাকা নিয়ে টুক করে বাসে উঠে শহরে চলে যায়। ক'দিন আগে মানা অফিসে গিয়ে কেরাণীবাবুকে যাতাভাবে অপমান করেছিল। আমি মানাকে ব্যাপারটা চেপে যেতে বলেছিলাম। কিন্তু মানাটা গোঁয়াড়। আমার কথা শুন্‌ল না। এখন বুঝুক ঠেলা।

বাসে ওঠার আগে অফিসার সাহেব হাতে পোর্ট ফোলিও ব্যাগ ঝুলিয়ে তীব্র দৃষ্টিতে সুখেনের আড়তের দিকে তাকাতে থাকেন। বাস ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে মানা ছুটে আসে জীবনের কাছে। দুপা জড়িয়ে ধরে।

—বাবু আমাকে বাঁচান। সাহেব যাবার সময় বলে গ্যালেন, আমাকে জেলে পুরে ছাড়বেন। সত্যি বলছি বাবু, আমি ভেজাল দেইনি, ভেজাল দেই না। যতটা পারি কমদামে শহর থেকে ভাল জিনিষ কিনে আমরা গ্রামের গরীব মানুষদের কাছে বিক্রি করি। এতটুকু গাঁয়ে কতগুলো দোকান দ্যাকেন!

জীবন কলকাতায় বহুদিন কাজ করেছে। ভেজাল যে মানারা দেয় না জীবন তা ভালই জানে। ব্যবসায়ী জগতে মানারা যে হাতীর পাশে পিঁপড়েও নয়, জীবন তাও বোঝে। অথচ দেশ জুড়ে আইনের যত প্রয়োগ চলেছে এই মানাদেরই ওপর। মানার হাত ধরে জীবন পাশে বসায়।

—তোমার ভয় কি! আমি তো আছি। দেখা যাক না কি হয়!

জীবনের সান্ত্বনায় মানা শান্তি পায় না। মানা কাঁপছে। জীবন বলে—মাল তোল কোত্থেকে?

গর্ব মেশান স্বরে মানা বলে—শহরের মহাজনের ঘর থেকে মাল তুলি বাবু। কলকাতা থেকে ওনার নরি নরি মাল আসে।

মহাজনের নাম শুনে জীবন চিনতে পারে। মানার গায়ে হাত বোলায়।

—দেখ মানা, কোন্ মহাজন দু পয়সা বেশী দাম নিচ্ছে, আর কোন্ মহাজন দু পয়সা কম নিচ্ছে, এ হিসেব করে মহাজন ঠিক করা উচিত নয়। তার থেকে পাঁচ দশখানা গাঁ ঘুরে দেখতে হয়, কোন্ দোকানটার বেশী সুনাম, কোন্ দোকানটা বেশী উন্নতি করেছে। সেই অনুযায়ী মহাজন ঠিক করতে হয়। দু পয়সা কম নিয়ে যে মহাজন মালে অসাধুতা করে, তার কাছ থেকে মাল তুল্‌লে কখনো দোকানের উন্নতি হয় না। হতে পারে না।

কয়েক মাস পরেই মানা আদালতের শমন পায়। তার বিরুদ্ধে খাদ্যে ভেজালের অভিযোগ আছে। রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, মানার দোকানের তেলের নমুনায় ভেজাল ছিল। এখন আদালতে তাকে প্রমাণ করতে হবে, সে নির্দোষ। নতুবা তার শাস্তি অনিবার্য।

শমন পেয়ে মানার মাথা ঘোরে। উকিল, মোক্তার, আইন, আদালত এসবের মানা কিছুই বোঝে না। যেটুকু জানে, টাকার কথা ভেবে চোখে অন্ধকার দেখে। কালো মেঘে ঢাকা অমাবস্যার অন্ধকার। কিন্তু প্রদীপের শিখাটা! মানার মনে পড়ে জীবনের কথা। ছুটে আসে জীবনের কাছে। শমন দেখায়।

—বাবু, আমার জেল হলে চারটে বাচ্চা নিয়ে বৌটা না খেয়ে মরবে। দোকানটাও নষ্ট হয়ে যাবে।

—ভয় পাও কেন! মদ সিগারেট শরীর পক্ষে ক্ষতিকর। এটা সরকার নিজেই স্বীকার করেছে। তবুও সরকার ব্যবসাদার সবাই এসব জিনিসের ব্যবসা করে পয়সা রোজগার করছে। বর্তমানে দোকানদারী করলে পুলিশ আসবে। মামলা হবে। জেলে যেতে হবে। এসব মেনে নিয়েই দোকানদারী করতে হবে। তোমার ভয় নেই মানা, কেসে যত টাকা খরচ হবে আমি দেব। তোমার জেল হলে আমি তোমার সংসার চালাব।

মানাকে সঙ্গে নিয়ে জীবন শহরের সব থেকে নামকরা উকিলের কাছে যায়। এ মামলা লড়তে হবে। সব কিছু দেখেশুনে উকিলবাবু পরামর্শ দেন।

জীবনের বাড়ীর বিকেলের আড্ডায় এখন আরো একজন সদস্য বেড়েছে। রমজান আলি সেখ। ভূদেবের বহুদিনের পরিচিত। সরকারী

কর্মচারী ছিলেন। এখন অবসর নিয়েছেন। মানার ব্যাপারটা নিয়ে জীবনের এই বাড়াবাড়ি ভূদেব মোটেই পছন্দ করে না। ভূদেব জীবনকে তাড়া দেয়।

—মানার ব্যাপারটা নিয়ে খুব দেখালি বটে। আর দেখাস না। ওরা সব নীচু জাত। ছোটলোক। ওদের জেলে গেলেই বা কি, ঘরে থাকলেই বা কি! তুই ওদের সম্বন্ধে জানিস কতটুকু। ওরা সাংঘাতিক। মানার একবার অসুখ করেছিল। ঐ মাগীটা মাঠে মিন্‌সেদের সঙ্গে মুনিষ খাট্‌ত। জল-কাদা হাতে মুনিষগুলো ওর মাই দুটো টিপে ধরত। আমি কতদিন নিজে চোখে দেখেছি।

জীবন হাসে।

—ভূদেব তুই চুপ কর। তুই দারুণ রেগেছিস।

ভূদেবের আজ অন্য রূপ। থাবায় সাজারুর কাঁটা বেঁধা সুন্দরবনের বাঘ।

—চুপ করব কেন? মিথ্যে বল্‌ছি নাকি? সন্ধ্যেবেলায় মাঠ থেকে ফিরে জমিদার বাড়ীতে চিঁড়ে কুটতে যেত। রাতে জমিদারবাবুর ছেলেকে দেহ দিয়ে পয়সা নিয়ে ঘরে ফিরে মানার সঙ্গে ন্যাকামো করত। এসব কথা গাঁয়ের কে না জানে। যত সব নোংরা ব্যাপার!

হো হো। জীবন বুক চিতিয়ে হাসে। রমজান আলির চোখে মুখেও অস্বস্তি।

—ভূদেব তুই গল্প লেখ। আধুনিক উপন্যাস তোর হাতে জম্‌বে ভাল।

ভূদেব ক্রুদ্ধ। জীবনকে ছিঁড়ে খেতে চায়।

—ঠাট্টার কথা নয় জীবন। তখনি আমি তোকেও বলেছিলাম, মানাকেও বলেছিলাম, ইন্সপেক্টর বাবুকে শতখানেক টাকা দিয়ে ঝামেলাটা মিটিয়ে ফেল্‌তে। কিন্তু না তুই না মানা কেউই আমায় পাত্তা দিলি না। এখন তুই আবার আগুন নিয়ে খেল্‌তে যাচ্ছিস।

জীবন এবার বেশ গম্ভীর। চাউনিতে সন্দেহ।

—ইন্সপেক্টর বাবুকে একশো টাকা দিলে ঝামেলাটা মিটে যেত, তুই বুঝলি কি করে?

—এতে বোঝার কি আছে! মানার দোকান থেকে ঘুরে যাবার পরই ইন্সপেক্টর বাবু লোক দিয়ে সুখেনকে ডাক করিয়ে ছিলেন। সুখেনকে উনি তখনি বলেছিলেন—শতখানেক টাকা দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেল্‌তে। নতুবা মানার জেল হয়ে যাবে। মানাকে এসব কথা তো সুখেন জানিয়েছিল। এইতো ক'দিন আগে ইন্সপেক্টর বাবু নিজে আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন। যাবার সময় খুবই ভদ্রভাবে বলে গেলেন—জীবনবাবু এসব ব্যাপারে যেন নিজেকে জড়িয়ে না ফেলেন। উনি ভদ্রলোক, ছোটলোকের ব্যাপারে ওনার যাওয়া উচিত নয়।

ভূদেবের কথা শুনে জীবনের মুখের চেহারা বদলে যায়। রমজান আলিও বিব্রত। কপালে হাত রেখে জীবন বলে—এখন মানাকে পরিত্যাগ করা মহাপাপ হবে। দেখি কি করা যায়!

* * *

ভূদেব, রমজান জীবনের বাড়ীর বিকেলের আসরে অনেকক্ষণ এসে গেছে। কমলা এক রাউণ্ড চা দিয়ে গেছে। কিন্তু জীবন বাড়ীতে নেই। মিটিং শুনতে গেছে। ঐতো ওর দোষ! যে কোন পার্টির যে কোন নেতা সাধারণ সভা করলে জীবনের সেখানে যাওয়া চাই। ভূদেব এসব পছন্দ করে না। সন্ধ্যের একটু আগে জীবন ফেরে।

—মিটিং শুন্‌তে গিয়েছিলি ঠিক?

নীরস স্বরে ভূদেব বলে।

—হ্যা।

—এসব শুনে কি লাভ হয় বল্‌ত?

—লাভ লোকসানের ব্যাপার নয়। ইচ্ছে হয়, যাই! নেশা বল্‌তে পারিস্।

—বলিহারি নেশা তোর! আমার তো মনে হয় দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকগুলোই দেশের সব থেকে বড় শত্রু। এরা পার্টি করে।

ঘুষ খায়। মিথ্যে কথা বলে। কম কাজ করে। নানাভাবে আইনের সুযোগ নেয়। এরাই সমাজের নানা সমস্যা নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করছে। এদের কথার আবার শোনার কি আছে! সাধারণ মানুষের মনের মত করে যে যত পালিশ করা মিথ্যে কথা বলতে পারে সেই তত বড় নেতা।

জীবন হাসে।

—এই জন্যেই তো মানার হয়ে আমাদের লড়ার দরকার।

ভূদেবের কথার আগুনে ঠাণ্ডা জলের ছাট লাগে।

—কিন্তু এভাবে তুই কটা মানাকে বাঁচাতে পারবি? তার থেকে মানা কোর্টে দোষ স্বীকার করুক। সামান্য শাস্তি হবে। ইন্সপেক্টরবাবু বলেছেন। আরে বাপু, প্রতিদিন তো দেখি এই শহরের দু চারটে মনিহারী, লোহালক্কার, মুদির দোকানে এনফোর্সমেণ্ট পুলিশ ঢুকছে। টাকা পয়সা দিয়ে সবাই মিটিয়ে ফেলে। কোর্ট কাছাড়ির ঝামেলায় কেউ যেতে চায় না। মফঃস্বলের দোকানে সারাদিন খুচরো পাইকারী বেচাকেনা করে আইন অনুযায়ী খাতাপত্র ঠিক রাখা অসম্ভব।

জীবনের গলায় বিদ্রোহের আগুন।

—টাকা পয়সা দিয়েই তো দোকানদাররা ভুল করে। ক্রমাগত ওদের লালসা বেড়ে যাবে। কত টাকা দেবে? তার থেকে কোন দোকানে পুলিশ ঢুকলে আশপাশের সব দোকানদার এক হোক। সঙ্গে কিছু সাধারণ মানুষ নিক। সব দোকানে, এমনকি সরকারী হোলসেল কনজুমার্সগুলোতেও ওদের ঢুকতে বাধ্য করুক। কেউ ঘুষ দেবে না। সবাইকে কেস দিক। সবাই মামলা লড়ুক। প্রতিদিন এ রকম পাঁচ-সাতটা মামলা হলে বাবুদের মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

সুযোগ বুঝে রমজান আলি বলে—আমি যা বুঝি, এই সব দোকানদারগুলো এক ধরণের শ্রমিক। এরা সারা দেশ জুড়ে সংগঠন করে সরকারের অবাস্তব আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেই পারে। যে কোন সংগঠনকে সব সরকারই ভয় করে।

জীবনের মুখে হাসি ফোটে।

—আরে ভাই, দোকানদাররা সংগঠন করবে কখন! একজন সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক বা কারখানার শ্রমিক ছুটির দিন ছাড়া ডিউটি করেন সাত থেকে আট ঘণ্টা। আর একজন দোকানদারকে দোকানদারী করতে হয় প্রতিদিন চোদ্দ থেকে ষোল ঘণ্টা। সাপ্তাহিক বন্ধের দিন মোকাম ছুটতে হয় মাল কিনতে। সংগঠন করে কলকাতার বড় ব্যবসায়ীরা। মফঃস্বলে এটা প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া ওদের নিজেদের মধ্যে এত প্রতিযোগিতা যে একটা ঠাণ্ডা হিংসা ওদের মধ্যে স্থায়ী বাসা বেঁধে থাকে। এক হওয়া তো দূরে থাক, একে অপরের কোন ক্ষতি করতে পারলেই খুশী। শিক্ষার অভাবও এর একটা কারণ হতে পারে।

ভূদেব বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়ায়।

—আসলে সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্যেই সরকার আইন তৈরী করছে। অথচ সরকারী কর্মচারীরা নিজেদের সুবিধা মত সেগুলোকে এমনভাবে প্রয়োগ করছে যে সামাজিক সমস্যা কমার বদলে দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে জীবন পায়চারী করছে দোতলার বারান্দায়। রমজাম আলি আসে। এত সকালে রমজান আলি! সঙ্গে ওটা আবার কে! দুজনের হাতে দুটো বড় বড় মিষ্টির প্যাকেট। ব্যাপার কি!

—আমার ছেলে এহুরোদ্দিন আলি সেখ। এ বছর এ্যাপ্‌লায়েড ফিজিক্সে এম, এস্‌সি পরীক্ষা দিয়েছিল। ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট হয়েছে। গতকাল রাতে আমরা খবর পেলাম।

বাপের কাছে ইঙ্গিত পেয়ে এহুরোদ্দিন জীবনের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। অপ্রস্তুত হয়ে জীবন বলে—একি করলে বাবা! তুমি এত বিদ্বান! আমার পায়ে হাত দিতে গেলে কেন? আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ।

—সে কি কথা দাদা! আপনার মত মানুষের আশীর্বাদ পেলে ও জীবনে অনেক বড় হতে পারবে! আপনি ওকে আশীর্বাদ করুন।

জীবনের মুখে হাল্কা হাসি।

—মানুষের আশীর্বাদে কি যায় আসে আলি সাহেব? যে যার কপাল নিয়ে জন্মায়। জীবন কমলাকে ডাকে। মিষ্টির প্যাকেট দুটো নিয়ে যেতে বলে। এহুরোদ্দিনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়।

—আমার মেয়ে কমলা। ফাষ্ট ডিভিসনে পি. ইউ. পাশ করে বি. এস্‌সি পড়ছে। ফিজিক্স অনার্স।

এহুরোদ্দিন বুদ্ধি দীপ্ত। স্মার্ট। চাবুকের মত চেহারা। কমলার ভাল লাগে। মাথা নীচু করে লাজুক মুখে কমলা বলে—বি. এস্‌সি এখানকার কলেজ থেকে পাশ করেছিলেন?

—হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করেছিলাম এখানকার স্কুল থেকে। বি. এস্‌সি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে।

ব্যক্তিত্বে ভরা এহুরোদ্দিনের কণ্ঠস্বর।

কমলা চা তৈরীর ছুতো করে চলে আসে। মনটা কিন্তু ছুক ছুক করতে থাকে এহুরোদ্দিনের সঙ্গে আরো একটু আলাপ করার জন্যে। চা জল খাবার টেবিলে সাজিয়ে কমলা ইসারায় জীবনকে ডাকে ঘরের মধ্যে। বাপের কানে ফিস ফিস করে। হো হো। জীবন হাসে। কমলা অপ্রস্তুত। দরজার আড়ালে লুকায়।

—যা বলার তুই নিজেই বল না। আমাকে বল্‌তে বলছিস কেন?

কমলা আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকে।

রমজান আলির মুখেও হাসি।

—কি ব্যাপার দাদা?

—ফিজিক্সের কিছু কিছু জিনিস ও বুঝতে পারে না। তাই মেয়ের অনুরোধ আপনার ছেলে যদি ওকে একটু সাহায্য করে।

—এ আর এমনকি কথা! এখন ও রিসার্চ করবে। অবসর সময়ে অনায়াসে আস্‌তে পারবে।

এহুরোদ্দিন কথা বলে। ব্যক্তিত্বপূর্ণ মনমাতানো কণ্ঠস্বর।

—শুক্রবার আর রবিবার আমি বাড়ীতে থাকি। ঐ দুদিন আসতে পারি।

এতদিনে কমলা মনের মত শিক্ষক পেল। এহুরোদ্দিন পেল প্রথম ছাত্রী। ফার্ষ্ট পার্ট টেষ্টের রেজাল্ট কমলা আগের পরীক্ষাগুলোর তুলনায় অনেক ভাল করে।

আজকাল কমলা এহুরোদ্দিনের সঙ্গে বেশ সহজভাবে কথা বলে। এহুরোদ্দিনের সেই দুর্দান্ত গাম্ভীর্য, প্রিনসিপ্যাল প্রিনসিপ্যাল ভাব এখন অনেকটা কমেছে।

হাসি মুখে একদিন কমলা বলে—আচ্ছা মাষ্টার মশাই, আপনারা তো বাঙালী! কিন্তু আপনাদের নামগুলো এমন অদ্ভুত কেন?

এতটুকু না ভেবে এহুরোদ্দিন জবাব দেয়—আমাদের মা বাপ্‌রা ভালবেসে ঐ সব নাম রাখেন বলে।

কমলার মুখে মিষ্টি হাসি। গালের টোল দুটো পরিষ্কার।

—মা বাপ্‌রা এমন নাম রাখেন কেন? বাঙ্‌লা ভাষায় নামের কি অভাব আছে?

এহুরোদ্দিন বেকায়দায় পড়ে।

—তাইতো! কিন্তু আমি তো এর উত্তর জানিনা। কি করা যায় বলত?

কমলার চোখে মুখে দুষ্টুমী।

—আচ্ছা দেখুন ওপার বাঙ্‌লার লোকেরা বাঙ্‌লা ভাষার জন্যে কত প্রাণ দিল। কত রক্ত ঝড়াল। কত লড়াই করে পাকিস্তানের থেকে আলাদা হ'ল। কিন্তু ওনাদের নামগুলোই বাঙলা ভাষায় নয়। এই দেখুন না, আপনার নাম এহুরোদ্দিন আলি সেখ না হয়ে যদি উদয় আলি সেখ হ'ত, তাহলে কি ক্ষতিটা হ'ত? উদয় শব্দটা হিন্দু বাঙালীদের তো কেনা সম্পত্তি নয়!

এহুরোদ্দিন মুচ্‌কি হাসে।

—বেশত, আমাকে মাষ্টার মশাই না বলে, উদয়দা বলেই ডেকো। এ অধিকার কিন্তু শুধুমাত্র তোমার। কি, হ'ল তো ?

দেহের সমস্ত রক্ত অশান্ত সমুদ্রের ঢেউয়ের মত কমলার মুখে ঝাপটা মারে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। শাড়ির আঁচলটা সাপ্‌টা দিয়ে কোমরে গোঁজে। বুকটা উঁচু হয়ে ওঠে।

—আপনার জন্যে চা করে আনি।

কমলার ফার্ষ্ট পার্ট ফাইনাল শুরু হতে আর বেশী দেরী নেই। কমলা আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছে। সারাদিন বইয়ে মুখে থাকে। তার উদয়দাও চেষ্টার ত্রুটি করছে না। আজকাল উদয় অল্প সময়ের জন্যে হলেও প্রায় প্রতিদিনই পড়াতে আসে। স্থানীয় ছেলে কলেজে অধ্যাপকের কাজ পেয়েছে। রিসার্চের কাজে কিছুদিন ছুটি নিয়েছে।

পড়াশুনার চাপ থাকায় কমলা এখন জীবনের তেমন যত্ন নিতে পারে না। সারাদিন দোকানদারদের পাকা খাতা দেখা লেখা আর এদোকান ওদোকান ঘুরে বেড়ানই জীবনের এখন কাজ।

আজ সকালে মানা এসেছিল। উকিলবাবু বলেছেন আগামী কাল মামলার রায় বের হবে। মানা আজ তাই খুব খুশী। জীবনকে প্রণাম করে মানা বলে—বাবু, এ যাত্রা আপনার জন্যে বেঁচে গেলাম। আপনার মত মানুষ না থাকলে আমার মত গরীব মানুষ মরে যেতাম। আপনি দেবতা।

—বেঁচে গেলে কি মরে গেলে তা বুঝলে কি করে ? রায়ত এখনো বেরোয়নি। আগামী কাল কি হয় দেখা যাক !

ব্যস্ত হয়ে মানা বলে—না, না, বাবু, উকিলবাবু বলেছেন, এ মামলায় আমাদেরই জিত হবে। উকিলবাবু দারুণ লড়েছেন। শহরের সেরা উকিল ; কত নাম যশ !

সঙ্গে আনা চটের ঝোলায় মানা হাত পোরে। একটা মিষ্টির হাঁড়ি জীবনের পায়ের কাছে রেখে হাত জোড় করে।

—এটুকু সেবা করবেন।

জীবন বিরক্ত হয়। মুখটা কঠিন করে।

—না না মানা এটা তুমি মোটেই ভাল কাজ করনি। গরীব মানুষ তুমি, এসব আন্‌তে গেলে কেন?

মানা কপালে হাত ঠেকায়।

—বাবু, গরীব হলেও মানুষত বটে! আপনার মত মানুষের সেবা করতে যে ইচ্ছে যায়!

জীবন কমলাকে ডাকে। একটা থালা আনতে বলে। কমলা, বৌমা, এহুরোদ্দিন ইত্যাদি নাম হেঁকে ছটা মিষ্টি থালায় রাখে। হাঁড়িটাকে নিজের হাতে ভাল করে বাঁধে।

—একটু আগে তুমি আমায় দেবতা না কি যেন বলছিলে! এই হাঁড়ির মধ্যে দেবতার প্রসাদ আছে। বাচ্চাদের দিও, বৌমাকে দিও, আর তুমি খেও।

জীবনের চোখে মুখে জয়ের আনন্দ।

মানার চোখে জল। চিবুক বেয়ে টপ টপ করে পড়ছে। জীবনকে প্রণাম করে। দু'হাত দিয়ে মিষ্টির হাঁড়িটা মাথায় তুলে গাঁয়ের পথে পা বাড়ায়।

বাড়ীতে ফিরে মানার মনটা আজ বেশ খুশী খুশী। ঠাট্টা করে বৌকে বলে—বৌ, তোর রুপার পৈছা জোড়া দিস। মামলায় হেরে গেলে পৈছা বেচে পালাব।

বৌ মানার কথার উত্তর দেয় না। মানার জন্যে বৌ অনেক করেছে। বাপের কাছে পাওয়া অনেক সখের জিনিস একটা করে বিক্রি করেছে। কিন্তু শেষ সম্বল রুপোর পৈছা দুটো কিছুতেই নষ্ট করেনি। কতদিন না খেয়ে কাটিয়েছে। তবু বাপের শেষ স্মৃতি সাধের পৈছা দুটো হাত ছাড়া করেনি। সকালে ঘুম থেকে উঠে বৌ বায়না ধরে।

—তোমার সঙ্গে শহরে যাব। আতে খারাপ স্বপন পেয়েচি।

—দূর পাগলী। তুই কোথা যাবি! চিন্তা করিস না। এ মামলায় আমাদেরই জিত হবে। উকিলবাবু কয়েছেন।

—তা হোক। আমি যাবই। সেই ছোটকালে বাপের সাথে শহরে গেইচিলাম। কিছু মনে নাই। শুনেচি, শহরে সাজান গোছান বড় বড় ঘর আছে। সেখানে ভাল ভাল পালা দেখায়। আসার সময় তোমার সঙ্গে পালা দেখব।

মানা আর আপত্তি করতে পারে না।

দু ক্রোশ পথ হেঁটে অন্য গাঁ থেকে বৌ বড় দিদিকে ডেকে আনে। ছেলেপুলেগুলোকে দেখাশুনা করতে হবে। কোলের ছেলেটাকে কাঁকে নিয়ে বৌ মানার সঙ্গে সোজা চলে আসে আদালতে। আদালতের সামনের মাঠটায় একটা বিরাট পেঁও গাছ। ছাতার মত বহুকাল দাঁড়িয়ে আছে। এই পেঁও গাছটার নীচে পুলিশ তাদের কালো গাড়িগুলো রাখে, আসামী নিয়ে যাবার জন্যে। ঐ গাছের ছায়ার একপাশে মানার বৌ কোলে ছেলে নিয়ে মানার অপেক্ষায় থাকে। গাড়ির হর্ণের বিকট শব্দ। রিক্সার প্যাঁক প্যাঁক। লোক-জনের ছোটাছুটি। বাচ্চাটা ভয় পায়। মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। আশপাশের লোক বিরক্ত হয়। বৌকে তুইতোকারি করে। উঠে যেতে বলে। আঁচল দিয়ে বাচ্চার মুখ ঢেকে বুকের দুধ দিয়ে বৌ বাচ্চাকে শান্ত করার চেষ্টা করে।

মানার মামলার রায় শোনার জন্যে আদালত কক্ষের দর্শক আসনে আজ জীবনকেও দেখা যায়। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে মানা বিচারকের রায় শোনে। মানার অপরাধটা খুবই গুরুতর। তবু প্রথম অপরাধ বলে বিচারক মানার অল্প শাস্তি দেন—দু' মাস জেল। তিনশো টাকা জরিমানা। অনাদায়ে আরও এক মাস জেল।

মানার দুহাত বাঁধা। সামনে পেছনে পুলিশ। মানাকে চোরের

মত কালো গাড়ির দিকে নিয়ে আস্‌ছে। ছেলেটাকে কাঁকে নিয়ে বৌ জিজ্ঞেস করে—তুমি কোথা যাও গা ?

পুলিশ ধাক্কা দিয়ে মানাকে গাড়িতে তোলে।

—আমার সাজা হয়ে গেল। তুই ঘরে ফিরে যা। ছাওয়ালদের দেখিস। ভয় নাই, বাবু আসেন। দেখ্‌ ভাল করবেন।

মানার মুখ নড়ছে। আরও কিছু যেন বল্‌ছে। শোনা যাচ্ছে না। কালো গাড়ি ষ্টার্ট নিয়েছে। প্রচণ্ড শব্দ।

মানার বৌ মানাকে ছাড়তে রাজী নয়। কাঁদছে। চিৎকার করে কাঁদছে। কাঁকে ছেলে নিয়ে গাড়ির পেছনে ছুট্‌তে থাকে।

—ও বাবুরা, আমার রুপার পৈছা লাইয়া য্যাও। আমার সোয়ামীরে ছাইড়া দ্যাও। ও বাবুরা, আমার রুপার·········

ছেলে কোলে গাঁয়ের মেয়ে যন্ত্রের সঙ্গে কতক্ষণ আর ছুটতে পারে। একটু দূরে গিয়ে শাড়িতে পা জড়িয়ে মুখ থুবড়ে বৌ লুটিয়ে পড়ে। কাছে দাঁড়িয়ে জীবন সবকিছু লক্ষ্য করছে। দু' চোখে তার শ্রাবণের ধারা। উকিলবাবু জীবনের সামনে আসেন।

—আমি দুঃখিত! সাধ্যমত চেষ্টা করেও ছেলেটাকে জেলের হাত থেকে বাঁচাতে পারলাম না।

—ধার দিয়ে টাকা চাইতে গেল বলে গরীব দোকানদারটার জেল হয়ে গেল।

জীবন আর বল্‌তে পারে না। গলার স্বর জড়িয়ে যায়।

তিন বন্ধুর বিকেলের আসরটা আজ ভালই জমেছে। ভূদেব বেশ করিত-কর্মা লোক। কেউ যখন চালের রিটেল লাইসেন্স পাচ্ছে না, ভূদেব তখন তার মেজ ছেলের নামে হোলসেল লাইসেন্স বের করে ফেলেছে।

—তোর ক্ষমতা আছে ভূদেব। তুই পারবি।

ভূদেবের দিকে তাকিয়ে জীবন বলে।

—এতে আর ক্ষমতার কি আছে ভাই! লোকে এখন ঠিক লাইনটা বুঝ্ছে না, তাই লাইসেন্স পাচ্ছে না। আগে অফিসারদের টাকা গুঁজে কাজ করাতে হ'ত। এখন ধারাটা একটু বদ্লেছে। এখন কমিটির লোকদের টাকা গুঁজলেই কাজ হয়ে যায়।

অবাক হয়ে জীবন বলে—সেকিরে ভূদেব! এরা লাল ঝাণ্ডা ধরে। সরকারের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। আবার ঘুষও খায়! আমার তো বিশ্বাসই হতে চাচ্ছে না।

ভূদেবের মুখে হাসির ঝিলিক।

—তুই হাসালি জীবন! তুই সন্ন্যাসী হয়ে যা। অত বড় অফিসটায় মাত্র দুটো লোক সৎ। কয়লা আর ভুষি মালের ডিলিং ক্লার্ক ওরা। ব্যবহার ভাল, পয়সার ধারে কাছে যায় না। শুনি ওরা নাকি কমিটির নেতা। আর সব এক একটি মাল।

রমজান আলি ফোড়ন কাটে।

—ভূদেব ঠিকই বল্ছে দাদা। ওদের দুটো পয়সা চারটে হচ্ছে না বলেই ওরা লাল ঝাণ্ডা ধরে। লালের সাধারণ আদর্শগুলোর সঙ্গেও ওদের কোন সম্বন্ধ নেই। ওরা লালের কলঙ্ক। সাধারণ মানুষ ওদের দুচোক্ষে দেখতে পারে না। মন্ত্রীগুলো সৎ আর কাজের তাই এখনো টিঁকে আছে।

ভূদেব মুচ্কি হাসে।

—নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল ; এই আর কি!

মোটা টাকা সেলামী দিয়ে বাজারের কাছে রাস্তার ওপর ভূদেব ঘর নিয়েছে! রমেন নানা মোকাম থেকে নানা রকমের চাল আমদানি করে বেশ মন দিয়ে ব্যবসা করছে। রমেনের দোকানে একদিন পায়ের ধূলো দেবার জন্যে জীবনকে ভূদেব অনেকদিন অনুরোধ করেছে।

কিন্তু ছ'মাসের ওপর হয়ে গেছে জীবন এখনো রমেনের দোকানে যায়নি। ও নাকি সময় পায় না। গতকাল বিকেলের আসরে ভূদেব এ নিয়ে খুবই বিরক্তি প্রকাশ করেছে। আজ তাই সকালের দিকে জীবন এসেছে রমেনের দোকানে। প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে গেছে। কোন খরিদ্দার নেই। জীবন বিস্ময় প্রকাশ করে।

—রমেন, চালের সঙ্গে তোমার মুদিখানার মালও রাখা উচিত। মুদিখানার মাল থাকলে বাজার করে ফেরার পথে খুচরো খরিদ্দার তো আসবেই। দোকান ফাঁকা পড়ে থাকা ব্যবসার পক্ষে দারুণ ক্ষতিকর।

—মুদিখানার ব্যবসায় বড় ঝামেলা কাকু। বড় বাজে ব্যবসা। তা ছাড়া একটা জিনিসে লাভ হয় ত পাঁচটা জিনিসে লোকসান হয়ে যায়।

—যে কোন ব্যবসায়ে লেগে থাকলে লোকসান বলে কোন কথা নেই রমেন। তিন টাকায় কিনে দু' টাকায় বেচলে এক টাকা লোকসান হয় না। কারণ ব্যবসাদার সেটা আবার ঠিক দু' টাকার কমে কেনে। কখন কোন্ মালের কেমন ষ্টক রাখতে হবে, ব্যবসা করতে করতে বোঝা যায়। ব্যবসায়ে লোকসান হয়, খরিদ্দারে টাকা মেরে দিলে, চুরি হলে, কোর্ট কাছারিতে জড়িয়ে পড়লে। পুঁজি ভাঙে আয়ের থেকে ব্যয় বেশী হলে।

—মুদিখানা জিনিসের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে কৈ ; যে লাভ হবে ?

রমেন জীবনকে এড়িয়ে চল্‌তে চায়।

জীবন হাসে !

—তুমিতো ও ব্যবসা কোনদিন করনি ; বুঝবে কি করে ? জিনিসের দাম খুব বেশী বেড়ে যাওয়া ছোট ব্যবসায়ীদের পক্ষে ক্ষতিকর। কারণ দাম বাড়লে বেচাকেনা কমে যায়। লাভের শতকরা

হারও কমে যায়। অন্যদিকে দোকানদারেরও সংসার থাকে। সংসার খরচ বেড়ে যায়। মাল বেচে মাল কিনতে গেলে পুঁজিতে কুলায় না। জিনিসপত্রের দাম কম থাকা, বাজার স্থিতিশীল থাকা ছোট ব্যবসায়ীদের পক্ষে সব থেকে ভাল।

রমেনের দোকানে এসে অবধি জীবন দাঁড়িবাটখারার দিকে বার বার লক্ষ্য করছিল। পাল্লায় পঁচানব্বই কেজি চাপান।

—কি ব্যাপার রমেন ; সবসমেত কুইন্টাল বাটখারা কেননি ?

জীবন বিস্ময় প্রকাশ করে।

—কুইন্টাল কেন কাকু, বেশী কেনেছিলাম। কিন্তু গত সপ্তাহে ওজন অফিসের নোটীশ পেয়ে দাঁড়ি বাটখারা সিল করাতে দিয়েছিলাম। একটা কুড়ি কেজির বাটখারা আর সিল করার উপায় নেই বলে ওরা বাজেয়াপ্ত করে নিল।

—কেন ? বাটখারাগুলো কতদিন আগে কিনেছিলে ?

—এইত ক'মাস আগে। মানে চালের হোলসেল লাইসেন্স পাবার পর।

—পাকা ক্যাশমেমো নাও নি ?

—হ্যা ; নিয়েছিলাম তো !

—তবে ?

চিন্তামণি যাচ্ছিল বাজারের দিকে। বহু পুরানো বিহারী মুটিয়া সর্দার। বৃদ্ধ হয়েছে। এখন আর কাজ করতে পারে না। কিন্তু বাজারের মায়া কাটিয়ে দেশে ফিরতেও চায় না। এককালের একজন ব্যবসাদার হিসাবে চিন্তামণি জীবনকে ভালই চেনে। জীবনকে দেখে চিন্তামণি কপালে হাত ঠেকায়।

—কি ব্যাপার চিন্তা ! মাত্র ছ' মাস আগে কেনা নতুন বাটখারা ওজন অফিস বাজেয়াপ্ত করল কেন ?

চিন্তা রমেনের দিকে তাকায়।

—বাটখারা ওজন অফিসে কাকে দিয়ে পাঠিয়েছিলেন ?

—আমি নিজে রিক্সা করে নিয়ে গিয়েছিলাম। দাঁড়ি বাটখারাগুলো অফিসে জমা দিয়ে খেতে গিয়েছিলাম। খাওয়াদাওয়া সেরে দোকানে ফেরার পথে ডেলিভারী নিতে গিয়ে জান্‌লাম বাটখারা বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

চিন্তা জীবনের দিকে তাকায়।

—বাবুজী, বাটখারা পাল্টাই হয়ে গেছে। অফিসে বহুত পুরানো বাটখারা থাকে। সুযোগ পেলে অফিসের বাবুরা ভাল বাটখারা সরিয়ে পুরানো বাটখারা দেখায়। পরে ভাল বাটখারা বাজার ছাড়া কম দামে অন্য জায়গায় বেচে দেয়। আমি তাই আমার আদমীদের হুশিয়ার করে দিয়েছি। ওরা কোন মহাজনের বাটখারা নিয়ে অফিসে গেলে সব সময় বাটখারার সঙ্গে থাকে।

রমেনকে লক্ষ্য করে জীবন বলে—তোমার বাটখারা নতুন কেনা। সে কথা অফিসের সাহেবকে জানালে না কেন?

—জানিয়ে কি হবে কাকু! কোন বাটখারা একটু ঘষে দিয়েছে, কোনটায় একটু সীসে লাগিয়েছে, তাতেই পঞ্চাশ টাকার বিল করে দিল। সাহেবকে এ ব্যাপারে বলতে গেলাম তো তিনি তেড়ে মারতে এলেন। বল্‌লেন, ওসব কারখানার ব্যাপার আমি কিছু বল্‌তে পারব না।

জীবন মাথা নীচু করে। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। আস্তে আস্তে উঠতে যায়। কিন্তু না। জীবনের ওঠা হ'ল না। বসতে বাধ্য হ'ল। রাস্তার পথ চলতি এক ভদ্রলোককে লক্ষ্য করে রমেন চিৎকার করছে।

—ও মশাই, ও দাদা, তিন মাস হয়ে গেল এখনো কি মাইনে পাননি? টাকাটা দিয়ে গেলেন না?

ভদ্রলোক তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন। চোখ রাঙান।

—দেখ হে ছোকড়া, তোমার স্পর্দ্ধা খুব বেড়ে যাচ্ছে। বলেছি তো, টাকা হলেই দিয়ে যাব। হোলসেল লাইসেন্স নিয়ে রিটেল চাল বেচ। ব্ল্যাক কর। বেশী ফুটুনি করলে চালাকি ঘুচিয়ে দেব।

ভদ্রলোকের চোখ রাঙানিতে রমেন ঘাবড়ে যায়। কিন্তু জীবন ভদ্রলোককে চেনে। মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক। একবার ওনার কোচিং-এ কমলাকে পড়াবার জন্যে জীবন ওনার বাড়ী গিয়েছিল। কিন্তু নাক উঁচু

করে উনি জানিয়েছিলেন, নিজের স্কুলের ছাত্র ছাড়া অন্য কাউকে পড়ান না। সকাল ছ'টা থেকে রাত দশটা অবধি দুটো ব্যাচ, আবার সন্ধ্যে ছটা থেকে রাত দশটা অবধি দুটো ব্যাচ পড়ান। প্রতি ব্যাচে দশ থেকে পনেরো জন বিভিন্ন ক্লাশের ছাত্র থাকে। আগে প্রতি ছাত্র সপ্তাহে পাঁচদিন পড়ার সুযোগ পেত। বছর তিন হ'ল চারদিন করেছেন। ছাত্র পড়াবার ফাঁকে বাজার করা, সংসারের খুঁটিনাটি কাজগুলো সেরে ফেলেন। জীবন তাই কথা না বলে পারল না। শান্ত স্বরে জীবন বলে —হোলসেল লাইসেন্স নিয়ে রিটেল চাল বেচে রমেন কালোবাজারী হ'ল। আর আপনি যাদের জন্যে প্রশ্নপত্র করেন, যাদের খাতা দেখেন, তাদেরই প্রাইভেট পড়ান। আপনি আদর্শ মানুষ হলেন! সমাজের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হলেন!

—বেশ করি পড়াই। গার্জেনরা পাঠায় কেন? ওঃ, উনি আবার দালালী করতে এসেছেন। চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা।

ভদ্রলোক মুখ ভেঙ্‌চান।

জীবন ছাড়ার পাত্র নয়। কিন্তু মেজাজটি ঠাণ্ডা।

—না, না, আমি পড়াতে মানা করছি না। আমি বল্‌ছি অন্য স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী পড়িয়ে তৈরী করুন না, তালেত' বুঝি!

দু একজন করে লোক জম্‌ছে। ভদ্রলোক আর কথা বাড়ান না। দ্রুত পায়ে এগিয়ে যান বাজারের দিকে।

* * *

কমলা মাত্র কয়েক নম্বরের জন্য পার্ট ওয়ান ফাইনালে ফার্ষ্ট ক্লাশ পায়নি। পার্ট টু ফাইনাল আরম্ভ হতে আর কয়েক মাস। পার্ট ওয়ানের ঘাটতি মিটিয়ে পার্ট টুতে ফার্ষ্ট ক্লাশ পেতে হবে। কমলার তাই চেষ্টার শেষ নেই। এহুরোদ্দিন, মানে কমলার উদয়দা কমলার দুর্বলতাগুলো শুধরে দেবার জন্যে প্রাণপাত চেষ্টা করছে।

কমলাকে এখন আর শেখানোর বিশেষ কিছু নেই। উদয় বলে —তোমার আমার মেলামেশাটা বড় বেশী হয়ে যাচ্ছে। আসা যাওয়ার

পথে তোমাদের পাড়ার ছেলেরা আজকাল আমাকে টন্ট্‌ করে। আমাদের সমাজটা বড় নিষ্ঠুর। এরপর তুমিও কষ্ট পাবে, আমিও কষ্ট পাব। মন দিয়ে পড়াশুনা কর। নিতান্ত আট্‌কে গেলে আমাদের বাড়ীতে গিয়ে দেখিয়ে এসো। কাল থেকে আমি আর আস্‌ব্‌ না। রাগ কোরো না।

কমলা চুপ করে থাকে কয়েক মুহূর্ত। তারপর জ্বলে ওঠে দামী তুবড়ির মত।

—কোন বন্দী সমাজকে আমি মানি না। আমি বুঝি আপনি পুরুষ মানুষ। আপনি আপনার পৌরুষ দিয়ে, পরিশ্রম দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, সৃষ্টি দিয়ে, দেশকে, দেশের মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন। আমি স্নেহ দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে, সেবা দিয়ে দেশকে সুন্দর করার চেষ্টা করবো। ভাবীকালের মানুষ হবে আমাদের জীবনযাত্রার বিচারক।

উদয় হাসে।

—বাঃ, বেশ কথা বল্‌তে শিখেছ তো। আচ্ছা আমি চিন্তা করে দেখি!

কমলার মুখে উত্তরটা যেন তৈরী ছিল।

—চিন্তা করে আবার কি দেখবেন! আপনি না এলে আমি পরীক্ষাই দেব না।

কমলার কথায় উদয় চমকে ওঠে।

কমলা তার উদয়দার জন্যে সবকিছু করতে পারে। উদয় একদিন না এলে কমলা লজ্জা ঘেন্নার মাথা খেয়ে পরের দিনই উদয়ের বাড়ীতে হাজির হয়। ব্যাপার কি! উদয় চিন্তা করে। কমলার এ ব্যবহার কি শিক্ষকের প্রতি ছাত্রীর কৃতজ্ঞতা, না অন্য কিছু। কিন্তু হিন্দু ঘরের সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে কি মুসলমান ছেলেকে ভালবাসতে পারে। হিন্দুরা মুসলমানদের শত্রু ভাবে, ঘৃণা করে, খুন করে। সুতরাং সব সময় সব মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। হিন্দুদের আরও বেশী ঘৃণা করতে

হবে। হিন্দুদের থেকে দূরে সরে থাকতে হবে। সুযোগ পেলেই ওদের সঙ্গে লড়তে হবে। এইসব কথাই তো এহুরোদ্দিন ছেলেবেলা থেকে শুনে এসেছে আত্মীয়দের কাছে। মুসলমান মজলিসে। মস্‌জিদের মৌলবীদের কাছে। কিন্তু কমলার বা ওদের বাড়ীর কারুর ব্যবহার তো তেমন মনে হয় না। আজ যে সব কথা কমলা বল্‌ল তার একটাই অর্থ হয়, কমলা তার উদয়দাকে ভালবেসেছে। কমলা প্রেমে পড়েছে। কিন্তু কমলার এসব কথা ছলনাও তো হতে পারে! এহুরোদ্দিনকে কোন প্যাচে ফেলার ফাঁদও তো হতে পারে। না না তাই বা হয় কি করে! এই তো গত বছর বর্ষাকালে উদয়ের কয়েকদিন জ্বর হয়েছিল। কমলা প্রতিদিন বাড়ী গিয়ে দেখা করেছে। ওষুধ খাইয়েছে। ফল কিনে এনে ছোট ছোট করে কেটে উদয়ের মুখে তুলে দিয়েছে, পাকা গিন্নীর মত। কমলার উৎকণ্ঠা দেখে উদয়ও মাঝে মাঝে লজ্জা পেয়েছে। যে দিন কমলা উদয়ের মায়ের কাছে জান্‌তে পারে যে ডাক্তারের সন্দেহ উদয়ের টাইফয়েড হয়েছে, সে রাত্রে কমলা মনে হয় ঘুমাতে পারেনি। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে কমলা ছুটে আসে উদয়ের বাড়ী। চুল উস্‌কো-খুস্‌কো। চোখ বসা। হাসকুটে মেয়ের মুখে হাসির চিহ্ন নেই। মানুষ কি এত ছলনা করতে পারে! এত অভিনয় করতে পারে! পারে। পারে না। এহুরোদ্দিন জীবনে বহু শক্ত শক্ত অঙ্কের সমাধান করেছে। কিন্তু কমলা-অঙ্কের সমাধানটা সে কিছুতেই করতে পারছে না।

কমলার ব্যবহারে উদয়ের মাও অবাক হতে বাধ্য হয়েছেন। একদিন তো মুখ ফস্কে উদয়ের কাছে বলেই ফেলেন—এমন একটা মেয়ের সঙ্গে যদি তোর বিয়ে দিতে পারতাম! যেমন সুন্দরী, তেমনি শান্ত।

মায়ের এ কথার কোন উত্তর দেয়নি এহুরোদ্দিন। মনে মনে ঠিক করে, কমলার পরীক্ষাটা হয়ে যাক। একদিন সরাসরি জিজ্ঞেস করতে হবে, কমলা উদয়ের বৌ হতে রাজী আছে কিনা।

সাত

রমেন চালের ব্যবসায়ে মোটেই সুবিধে করতে পারেনি। এর জন্যে অবশ্য রমেনের বিশেষ দোষ নেই। দোষটা রেশনের চালের। প্রতি সপ্তাহে বন্যার জলের মত রেশনের চাল খোলা বাজারে ঢোকে। চাষী ভাওচারে আমদানি করে হোলসেলাররা কম দামে সেই চাল বিক্রি করে। পাঁচ রকমের চাল কিনতে এসে রিটেলার কোন একটা চাল যে দোকানে বেশ কম দামে পায়, বাকি চাল সেখান থেকেই তুলে নেয়। অন্য দিকে আর তাকিয়ে দেখে না। মোকাম থেকে আইন মত আমদানি করা চাল লোকসানে বিক্রি করা ছাড়া উপায় থাকে না। রমেন রেশন ডিলারদের সঙ্গে লাইন করার অনেক চেষ্টা করেছে। পারেনি। চিনি, ভোজ্য তেল, ডাল, কেউ কেউ দিতে রাজী হলেও, চাল দিতে কেউ রাজী হয় নি। প্রতিটা ডিলারই কোন না কোন হোলসেলারের কাছে টিকি বিক্রি করে রেখেছে। সুতরাং চালের ব্যবসায়ে রমেনের অবস্থা, ছাগলের তিন ছানার তৃতীয় রোগা দুর্বল ছানাটার মত। রমেনের যে পজিশনে দোকান তাতে মুদিখানা রাখা ছাড়া উপায় নেই। ব্যবসা শুরু করার প্রায় আড়াই বছর পরে রমেন এটা বুঝতে পেরেছে। অথচ দু বছর আগে জীবন যখন এটা রমেনকে বুঝিয়ে বলেছিল, রমেন তখন আমলই দেয়নি।

প্রচণ্ড মানসিক আঘাতে জীবন এখন শয্যাশায়ী। বছর খানেক ধরে ভূদেবের সঙ্গে জীবনের যোগাযোগ নেই বল্‌লেই চলে। কমলাকে নিয়ে ভূদেবের সঙ্গে জীবনের এমন মতান্তর হয়েছে যা ওদের বন্ধুত্বে বড় রকমের ফাটল ধরিয়েছে। সুখেন বেশীদূর লেখাপড়া শেখেনি বটে, কিন্তু ধনে মানে পাত্র হিসেবে সুখেন কি অন্য কোন পাত্র থেকে কমা!

তাছাড়া ভূদেবের বংশ পরিচয়! তাকি জীবনের অজানা। ভূদেব তাই জীবনের ওপর চটে আগুন হয়েছে। জীবন অবশ্য ভূদেবকে অনেক বার বোঝাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ভূদেব কিছুতেই কিছু বুঝতে চায়নি। উল্টে এমন কিছু কিছু মন্তব্য করেছে যাতে রমজান আলিও বিরক্ত হয়েছে। শুধু বিরক্ত কেন, রমজান অপমানিত। জীবনের বাড়ীর বিকেলের আসরে ভূদেবের অনেক আগেই রমজান আসা ছেড়ে দিয়েছে। ভূদেবের মুখ দোষই যে এর কারণ জীবন তা বোঝে। কিন্তু বাল্য বন্ধু মনে আঘাত পায়, তাই তেমন কোন কড়া কথা জীবন বলতে পারেনি। রমজান আলির সম্মান রক্ষা করতে কোন ব্যবস্থাও নিতে পারেনি। জীবনের এই প্রচণ্ড দুর্দিনে, মনের এই ছিন্নভিন্ন অবস্থায়, কোন বন্ধু, কোন প্রতিবেশী, কতশত উপকৃত ব্যক্তি, কেউ যে জীবনকে এতটুকু সান্ত্বনা জানাতে আসেনি, এর জন্যে জীবনের কিছুমাত্র দুঃখ নেই। তবে সবকিছু জেনে ভূদেবও যে একদিনও এল না, এটাই জীবনের মানসিক যন্ত্রণাটাকে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। রমলা মারা যাবার পর এমন আঘাত জীবন আর কখনো পায়নি। সেই সুন্দর সকালগুলো। বিকেল গড়িয়ে আড্ডার রঙে রঙিন সন্ধ্যেগুলো। মনমাতানো শান্ত রাত-গুলো। আর কখনো আসবে বলে জীবন ভাবতেই পারে না। এখন প্রতিটা দিন প্রতিটা রাত যেন বিরাট এক একটা চলন্ত পাহাড়ের ছদ্মবেশে তার বুকের ওপর দিয়ে তিলে তিলে বয়ে যায়। এই রকম এক যন্ত্রণায় ভেজা বৃষ্টি থামা বিকেলে জীবন সিঁড়িতে কার যেন জুতোর শব্দ পায়। কেউ কি আসছে এ শ্মশানপুরিতে! জীবন কান পেতে শোনে। হ্যা; হ্যা; আসছেই তো! এ শব্দ যে জীবনের বড় চেনা জীবনের মনের সঙ্গে এ শব্দের যে গভীর আত্মীয়তা! আর একটু পরিষ্কার হোক শব্দটা। একবার কেউ ডাকুক সেই বহু পরিচিত গলায়। জীবন। ডেকেছে। ডেকেছে। জীবনের হৃদ্‌পিণ্ডটা অমৃতের স্পর্শ পেল। যেন অনেকদিন পরে সারা দেহে প্রাণের অস্তিত্ব খুঁজে পেল। বিছানা ছেড়ে ধড়মড়িয়ে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জীবন

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ভূদেব এসেছে। সঙ্গে রমেন। এতদিনে বন্ধুকে মনে পড়ল বন্ধু! এহেন চরম দুর্দিনে তোমার কটু কথা, তোমার ধম্‌কানি, তোমার হাসি, তোমার ঠাট্টা, আমি যে গোটা সৃষ্টি জুড়ে খুঁজে ফিরেছি! ভূদেবের উপস্থিতির আনন্দের রঙ্‌ জীবনের সারা দেহমনকে মাখামাখি করে দিয়েছে। ভূদেবকে বস্‌তে বলতেও জীবন ভুলে গেছে। মুখে তার এক মুখ দাড়ি। চুল এলোমেলো। জীর্ণ-শীর্ণ চেহারা। চোখ দুটো লুকিয়েছে গভীর গর্তে। জীবনকে দেখে রমেন চিনতেই পারেনি।

—একটা দরকারে এলাম।

জীবনের দিকে তাকিয়ে ভূদেব বলে।

জীবনের মুখে তবু কোন কথা নেই। এখনো সে একভাবে তাকিয়ে রয়েছে ভূদেবের দিকে। সেই চোখ। সেই মুখ। সেই কপাল। কি সুন্দর দেখতে ভূদেবকে। সমস্ত শক্তি দিয়ে জড়িয়ে ধরে আদর করতে ইচ্ছে করছে জীবনের!

—শুধু চালের ব্যবসা রমেন চালাতে পারছে না। মুদিখানার মালও রাখার দরকার।

জীবনের কাছে কোন সাড়া না পেয়ে ভূদেব আবার বলে।

রমেনের মুখে কৃত্রিম হাসি। বাপের কথায় সায় দেয়।

—বছর দুই আগে আপনি আমাকে মুদি ব্যবসার কথা বলেছিলেন। কিন্তু ও ব্যবসায় আমাদের কোন অভিজ্ঞতা নেই। আপনি যদি একটু সাহায্য করেন।

তবু জীবনের মুখে কথা নেই। আগের মতই দাঁড়িয়ে রয়েছে পাথরের মূর্তির মত। গলায় ঝাঁকুনি দিয়ে ভূদেব তাই আবার বলে—মানে, আমি বলছিলাম, রমেনকে সঙ্গে নিয়ে তুই যদি একটু কলকাতায় যাস। যদি মহাজনদের সঙ্গে একটু আলাপ করিয়ে দিস। কখন কোন্‌ মাল ধরতে হবে, কখন কোন্‌ মাল ছাড়তে হবে, এ ব্যাপারে তুই যদি বছর খানেক ওকে একটু সাহায্য করিস।

—নিশ্চয়ই সাহায্য করব। নিশ্চয়ই কলকাতায় নিয়ে যাব।

এতক্ষণে জীবনের মুখে কথা ফুটেছে।

ব্যস্ত হয়ে রমেন বলে—কবে আপনার সময় হবে কাকু ?

—আজই চল।

—আজত সন্ধ্যে হ'তে এল:। আজ কি করে যাবেন।

রমেন মুচ্‌কি হাসে।

—তবে কাল চল।

ব্যস্ত হয়ে ভূদেব বলে—না, কালকেও হবে না। টাকা পয়সা জোগাড় করতে হবে। তার থেকে তুই বরং সোমবারে যা। বারটাও ভাল।

--আজ কি বার ?

—বুধবার।

রমেন জবাব দেয়।

—এখনো পাঁচদিন ! আচ্ছা তাই হবে।

জীবন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে। ভূদেবকে সন্ধ্যে আহ্নিক করতে হবে। আর অপেক্ষা করার সময় নেই। কুলীন ব্রাহ্মণ বলে কথা। জীবন কলকাতায় যেতে রাজী হবার সঙ্গে সঙ্গে রমেন উঠে সিঁড়ির কাছে দাঁড়ায়। মিনিটখানেক অপেক্ষা করে ভূদেবও ঐ দিকেই পা বাড়ায়। কিন্তু পেছন থেকে শিশুর মত জামা টেনে ধরে জীবন।

—রমেন যাক্। তুই আরো একটু বস।

আবদারের সুরে জীবন বলে।

দোকান খোলার অছিলায় রমেন দ্রুত চলে যায়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভূদেব আবার চেয়ারে বসে। ভূদেবের গায়ে গা লাগিয়ে বসে জীবন বলে—ভূদেব, তুই যা বলবি তাই শুন্‌বো। যা নির্দেশ দিবি তাই করবো। শুধু তুই আমায় পরিত্যাগ করিস না। আমি তালে মরে যাব। আমি এই ধুলো বালির মাটিতে আরও কিছুদিন বাঁচতে চাই। আরও কিছু দেখতে চাই।

ভূদেবের চোখেমুখে অভিযোগ। জীবনের কথার কোন উত্তর দেয় না। ভূদেবের গাম্ভীর্যে জীবন উদ্বিগ্ন।

—ভূদেব, আমি যদি কোন অন্যায় করে থাকি, যদি তোর কোন ক্ষতিও করে থাকি, তবুত আমি তোর বাল্য বন্ধু। তুইও যদি ক্ষমা না করিস, কে করবে বল? আসলে প্রস্তাবটা তো তুই অনেকদিন আগেই দিতে পারতিস। তুই যখন প্রস্তাব দিলি তখন আমার আর কিছু করার ছিল না।

ভূদেব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। ঝাঁঝিয়ে ওঠে।

—ওসব কথা থাক্। তোর, তোর মেয়ের রুচিবোধটা যে দেহ ব্যবসায়ী গলির বাসিন্দাদের মত হতে পারে তা আমি বুঝবো কি করে? তাছাড়া তোর মেয়ে তো তখন পড়ছিল। পাশ করবে কি করবে না, তাইবা জান্‌বো কি করে?

ঘৃণার দৃষ্টিতে ভূদেব তাকায় জীবনের দিকে। চলে যাবার জন্যে পা বাড়ায়। দ্রুত পায়ে ভূদেবের সামনে এসে জীবন পথ আট্‌কায়। দুহাত দিয়ে ভূদেবের ডান হাতটা বুকে জড়িয়ে ধরে।

—যাস্‌না ভূদেব। যাস্‌না। সারাদিনে না পারিস অন্ততঃ বিকেলের দিকে একবার আসিস। যদি কথা বলতে প্রবৃত্তি না হয়, বলিস না। যদি কিছু খেতে ঘৃণা হয়, খাস না। তবু তোকে দেখেও আমি শান্তি পাব। তোর পায়ের জুতোর শব্দটাও আমাকে আনন্দ দেয়রে।

—আচ্ছা, আসবো।

অবজ্ঞার সঙ্গে ভূদেব বলে।

কথা ছিল রমেন আসবে জীবনের বাড়ী। দুজনে একসঙ্গে ওরা সকালের ট্রেন ধরবে। জীবন আজ তাই খুব ভোরে উঠেছে। স্নান সেরে প্রস্তুত হয়েছে। কিন্তু রমেন এত দেরী করে এলো যে ট্রেন পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। ষ্টেশনে পৌঁছে টিকিট কাটার লাইনে দাঁড়িয়ে জীবন

রমেনকে ট্রেন সম্বন্ধে খোঁজ খবর করার নির্দেশ দেয়। ট্রেন কিছুক্ষণ লেট আছে। কিন্তু টিকিট কাটার লাইনটাও তেমনি বিরাট। কি দারুণ ভীড়। টিকিট কাটার সময় হবে ত'? শহরের লোকসংখ্যা বেড়েছে চারগুণ। কিন্তু টিকিট কাউন্টার সেই একটা। গুঁতোগুতি। ধস্তাধস্তি। চেচামেচি। ছুটোছুটি। সব মিলিয়ে যেন কুরুক্ষেত্র। ট্রেনের ভাড়া বেড়েছে যত গুণ, প্যাসেঞ্জার বেড়েছে তার তত গুণ। আর যাত্রীদের কষ্ট বেড়েছে তার থেকেও অনেক গুণ। লাইনে দাঁড়িয়ে জীবন নানা কথা ভাবে আর চারিদিকে তাকায়। ওখানে ওটা কি হচ্ছে! কতকগুলো মস্তান টাইপের ছেলে হাতে এক গোছা টিকিট নিয়ে শেয়ালদা হেঁকে বিক্রি করছে! টিকিটের দাম কিন্তু বেশী নিচ্ছে না। সরকারী দামই নিচ্ছে। তাহলে এ কাজ করে ওদের লাভ? যাত্রীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে, নাকি জাল টিকিট বিক্রি করছে। কি সর্বনাশ! জাল টিকিট যদি হয়, রেলের কর্মচারী, পুলিশ ওদের কিছু বলছে না কেন! অনেক ভদ্রলোক তো লাইনে দাঁড়াবার ভয়ে ওদের কাছে টিকিট কিনছে। কিন্তু ওরা কি কেউই বোঝে না—এভাবে সরকারের অর্থনীতি কি দারুণভাবে মার খেতে পারে! টিকিটের বাড়তি ভাড়া বছর বছর তাদেরই গুনতে হবে। মাত্র বছর সাতেক জীবন কলকাতায় যায়নি। এরই মধ্যে যে কত রকমের পরিবর্তন ঘটেছে! জীবনের মাথায় হাজার চিন্তা ভীড় করে। সামনে আর মাত্র দুজন। ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকে গেছে। আর একজন। তাড়াতাড়ি টিকিট চাই। একখানা কুড়ি কাটার নোট দিয়ে জীবন দুখানা শেয়ালদা চায়। পেছন থেকে দারুণ ঠেলাঠেলি। জীবন কোন রকমে ফেরৎ টাকা আর টিকিট নিয়ে ট্রেনে উঠতে ছোটে। তাইতো রমেন কোথায়! ঐতো! জীবনকে ডাকছে। বুড়ো, কচি, আর মেয়েদের কুস্তনীতে হারিয়ে রমেন জীবনের জন্যে একটা ভাল জায়গা দখলে রেখেছে। তিন জনের সীটে চারজন। তবু জীবনের বসতে অসুবিধা হয় না। রমেন ছিল তাই, নতুবা এই বয়সে শিয়ালদা অবধি জীবনকে হয়তো দাঁড়িয়ে যেতে হ'ত। রমেনের চোখে মুখে এর জন্যে গর্বের সীমা নেই।

জীবন যখন যেটা খরচ করে, নোটবুকে লিখে রাখে। হিসাবটা মিলিয়ে নেবার অভ্যাসটা ওর চিরদিনের। টিকিটের দাম আর ফেরৎ টাকা যোগ করে জীবন কিছুতেই হিসাবটা মিলাতে পারছে না। বারবার হিসাবটা মেলাবার চেষ্টা করছে। জীবনের অবস্থা দেখে রমেন হাসে।

—কি কাকু, হিসাব মিলছে না তো ?

—না। ছুটো টাকা কম হচ্ছে।

—বেঁটে নিয়েছে কাকু ! বুকিং ক্লার্ক বেঁটেছে।

ফাজিলের মত রমেন বলে।

জীবনের ঠোঁটের ফাঁকে হাসির রেখা। চলন্ত ট্রেনের জান্‌লা দিয়ে বাইরের দিকে তাকায় !

—মনে হয় ছেলেটি ভুল করেছে।

—ভুল করেনি কাকু। আপনার মুখে একমুখ দাড়ি, মাথায় এলোমেলো চুল দেখে আপনাকে গোপাল ভেবেছে। গাঁয়ের লোকদের ওরা আদর করে গোপাল বলে। গোপাল পেলেই বেঁটে নেয়। উত্তর প্রদেশে আমার এক বন্ধুর দাদা এই চাকরী করে। গোপালদের কাছে বেঁটে বেঁটে সে অনেক টাকা জমিয়ে ফেলেছে।

একটু থেমে রমেন আবার বলে—ঐ জন্যেই আমি গতকাল আপনাকে দাড়িটা কামিয়ে নিতে বলেছিলাম। মাত্র কয়েকটা পয়সা বাঁচাতে গিয়ে আপনার ছুটো টাকা চলে গেল।

হো হো। জীবনের বুক ছুলছে। হাসিতে শব্দ। এতদিন পরে জীবন যেন আবার বাঁচল। মনের সেই প্রচণ্ড কষ্ট এখন তার অনেক কমেছে।

—না না ফেরার পথে কাউন্টারে বল্‌লেই মনে হয় ফেরৎ দিয়ে দেবে।

—দেবে না কাকু ! কাউন্টারের ওপরে লেখা আছে—কাউন্টার ত্যাগ করার আগে হিসাব মিলিয়ে নিন। উল্টে আপনি নানা ঝামেলায় পড়ে যাবেন।

ট্রেন ছুটছে। দুজন চেকার টিকিট চেক করছেন।

—টিকিট ?

—জীবন টিকিট দেখায়।

—টিকিট ?

—গ্রামের মহিলাটি টিকিট দেখায়।

—টিকিট ?

—অনিল।

—টিকিট ?

—মান্থলী।

ভদ্রলোক ডান হাতটা একটু তোলেন বুকের দিকে।

—টিকিট ?

—দেবু।

—টিকিট ?

—মণ্টু।

কত অল্প সময়ে কত লোকের টিকিট চেক হয়ে গেল। জীবনের চোখেমুখে বিস্ময়! ব্যাপার কি! চাপা গলায় রমেন কথা কয়।

—অনিল, দেবু, মণ্টু এরা প্রতিদিন অনেক যাত্রীদের শেয়ালদা পৌঁছে দেয়। টিকিটের মাত্র অর্দ্ধেক পয়সা নেয়। চেকার সাহেবদের সঙ্গে এদের লাইন আছে। আমিও তো গতকাল অনিলের সঙ্গে লাইন করে রেখেছিলাম। কিন্তু সাত তাড়াতাড়ি আপনি ধাঁ করে লাইনে দাড়িয়ে গেলেন। এমনকি দুটাকা করে মান্থলী নেব তারো সুযোগ দিলেন না।

সাত বছর আগে জীবন যখন কলকাতায় মাঝে মাঝে যাতায়াত করত, এ ধরণের কথা তখন একটু আধটু কানাঘুঁসো শুনত বটে। কিন্তু সেই জিনিসটা যে এখন এমন ব্যাপক হয়েছে, তা দেখে জীবন অবাক।

রমেনকে নিয়ে পোস্তা বাজারে পৌঁছে জীবন আবার বিস্মিত হয়। কিছু কিছু দোকানের সামনে লাল ঝাণ্ডা পোঁতা। লাল ঝাণ্ডা লাগান

দোকানগুলো হয় বন্ধ, নতুবা খোলা রেখে বেচাকেনা বন্ধ। কি ব্যাপার, জীবন খবর নেয়। যেসব মহাজন মুটিয়া ইউনিয়নের দাবী মেনে নেয়নি, তাদের ঘরে লাল ঝাণ্ডা পোঁতা। তবু তো আন্দোলন এখন অনেক কমে গেছে। কয়েক মাস আগে মুটিয়াদের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত হয়ে অনেক মহাজনকে নাকি হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। জীবন চারিদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। এই বাজারের প্রতিটা রাস্তা; প্রতিটা ধূলিকণা, দোকান ঘরগুলোর প্রতিটা ইঁটের সঙ্গে জীবনের পরিচয়। সেই ভাঙাচোরা রাস্তা। সেই নানা ধরণের দোকানপাট। সেই বাস, ট্যাক্সি, লরি, ঠেলা, রিক্সার জট। পূর্ব ভারতের বৃহত্তম বাজারটা ঠিক আগের মতই আছে। শুধু উঠে গেছে ট্রাম আর মুটিয়াদের ওপর মহাজনদের অত্যাচার। মুটিয়াগুলো কাজ করছে ঠিক আগের মতই। কিন্তু চোখেমুখে তাদের গভীর আত্মবিশ্বাস। অঙ্গে অঙ্গে তেজ যেন ঠিকরে পড়ছে। তারাও যে মানুষ একথা তারা যেন বুঝতে পেরেছে। কিম্বা কেউ তাদের বুঝিয়ে দিয়েছে।

ডালের ঘর থেকে তেলের ঘর। তেলের ঘর থেকে গুড়ের ঘর। এক রাস্তা থেকে আর এক রাস্তা। জীবন চড়কির মত ঘুরছে।

—কাকু, গুড়টার রঙ্ সোনার মত। নিলেন না কেন?

—টিনের ভেতরে ঝোল হবে। ওটা টিন পালটাই গুড়।

—কি করে বুঝলেন?

—টিনের গায়ে টোকা মারলাম যে! ঢ্যাপ ঢ্যাপ শব্দ। সার থাকলে ঠক ঠক করত। মাল কেনার আগে মালের দর আর কোয়ালিটি দুটোই খুব ভাল করে যাচাই করে নিতে হয়। মনে রেখ, কেনার মুখেই লাভ।

জীবন রমেনকে উপদেশ দেয় আর ঘুরতে থাকে।

—জ্যাঠাবাবু!

বহু পরিচিত রামলালের ডাকে জীবন চম্‌কে উঠে থম্‌কে যায়। ছুটে এসে প্রণাম করে রামলাল জীবনের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়।

—কবে এসেছেন কলকাতায়?

রামলালের চেহারায় অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। সেই লম্বা জুল্‌পী। সেই মাথার চুলে নানা রকমের কারিকুরি। সেই থুত্‌নীর ওপর অদ্ভুতভাবে ছাঁটা একটু দাড়ি। কোন কিছুই রামলালের মুখে খুঁজে পাওয়া যায় না। তার মুখে এখন এক মুখ চাপদাড়ি। চওড়া কপাল। সাধারণভাবে ছোট করে কাটা চুল। ধীর শান্তভাব। সব মিলিয়ে যেন একজন দার্শনিক। পা থেকে মাথা পর্যন্ত জীবন রামলালকে খুঁটিয়ে দেখে।

—আজই এসেছি। রমেন, আমার বন্ধুর ছেলে। মুদিখানার ব্যবসা করবে। মহাজনদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে এসেছি।

জীবনের চোখে মুখে তাচ্ছিল্যের ভাব। গলার স্বর খস্‌খসে।

—আমাদের ঘরে যাবেন না?

—না।

—একটু বসবেন না?

—না

—মুটিয়ারা যে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়! ঐ দেখুন, ওরা সব কাজ বন্ধ করে আপনার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

জীবন তাকিয়ে দেখে। ঐতো সেই মুটিয়াটা! যার ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে জীবন কাশীনাথের চাকরী ছেড়ে চলে গিয়েছিল। জীবনের চোখে চোখ পড়তেই দুহাত জোড় করে ও মাথা নীচু করে। রামলালও জীবনের ডান হাতটা নিজের বাহুর নীচে চেপে ধরেছে। সামনের দিকে পা না বাড়িয়ে জীবন আর থাকতে পারে না।

রামলালের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বল্‌তেও জীবনের ঘৃণা হয়। মানুষের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে যারা অসভ্যতা করে, চেহারায়, ব্যবহারে তাদের যতই আভিজাত্য আসুক না কেন, জীবনের কাছে তারা মানুষ নয়, জানোয়ার।

—বাবুজী কোথায়?

অন্য দিকে তাকিয়ে জীবন জিজ্ঞেস করে।

—বাবুজী গত হয়েছেন।

—সেকি, কবে ?

জীবন চম্‌কে ওঠে।

এ প্রশ্নের উত্তর দেয় কাশীনাথের ভাইপো। ভাইপোর মুখে বিদ্রুপের হাসি। ঘাড়টাকে অদ্ভুতভাবে দুলিয়ে ভাইপো বলে—রামলাল ভাইয়া হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার কয়েক মাস পরেই।

জীবনের কপালে চামড়ার ভাঁজগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

—কেন, মেজবাবু হাসপাতালে গিয়েছিল কেন ?

ভাইপোর মুখে ভেঙ্‌চি কাটা হাসি।

—বারে, মস্তান দিয়ে ভাইয়াকে মার খাওয়ালেন। দমদম থেকে কাকাজীকে টেলিফোনে জানিয়ে দিলেন। পনেরো দিন পরেও বেচারার জ্ঞান ফেরেনি। মুখখানা এমন ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল যে এখনো বেচারা দাড়ি রাখতে বাধ্য হয়। দোষ করল কাকাজী, শাস্তি পেল ভাইয়া।

রামলালের ধমক খেয়ে ভাইপো চুপ করে। কিন্তু জীবনের কৌতূহল তখন চরমে। লাফ মেরে গদিতে উঠে রামলালের পাশে বসে।

—কি ব্যাপার মেজবাবু, আমাকে বলতেই হবে।

রামলাল বিরাট জ্ঞানীলোকের মত হাত তুলে জীবনকে শান্ত হবার অনুরোধ জানায়। জীবন আর রমেনের জন্যে দৈ-মিষ্টি আনার নির্দেশ দেয়।

—ওসব কথা বাদ দিন জ্যাঠাবাবু। অতীতের কথা ভুলে যাওয়াই ভাল।

—না, আমায় সব কথা শুনতেই হবে। আমি এ সবের কিছুই জানিনা।

—আমারও তাই বিশ্বাস। কিন্তু বাবুজী এ ব্যাপারে পুরোপুরি আপনাকেই সন্দেহ করেছিলেন।

—বাবুজীর কথা থাক্ মেজবাবু। কমলার সঙ্গে নদীর ধারে বেড়িয়ে ফেরার পথে আমার সঙ্গে দেখা করবে বলেছিলে। দেখা করলে না কেন ?

—সে সব কথা এখন থাক না জ্যাঠাবাবু!

—না না তোমায় বলতেই হবে। না বল্‌লে আমি এখানেই আমরণ অনশন করব।

রামলাল শিউরে ওঠে। অনশন, ঝাণ্ডা, আন্দোলন এসব শব্দ শুনলেই আজকাল রামলালের মুখ শুকিয়ে যায়। আতঙ্কে কুঁক্‌রে যায়।

রামলালকে সব কথা বলতেই হ'ল।

—সেদিন বিকেলে কমলার নির্দেশ মত আমরা নদীর ধারে যে জায়গায় পৌঁছালাম, সেটা বেশ ফাঁকা আর নিরিবিলি ছিল। ভারি ভাল লেগেছিল আমার জায়গাটা। গাড়িটাকে লক করে নদীর পারের ওপর আমরা পাশাপাশি বসে মিনিট পাঁচেক কথাবার্তা বলেছি, এমন সময় জনাতিন মস্তান ধরণের ছেলে কমলার পাশ থেকে আমাকে টেনে নিয়ে প্রচণ্ড মারধর করতে আরম্ভ করল। কমলা কয়েক পা এগিয়ে এসে বল্‌ল, ওকে মারবেন না। কিন্তু একজন লোহার রড নিয়ে ওর দিকে তেড়ে গেল। ভয় পেয়ে কমলা পালাল। কিন্তু শাড়ীতে পা জড়িয়ে ও পড়ে গেল। গড়াতে গড়াতে একদম নদীর ধারে চলে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে আবার ছুটল। আমি বুঝলাম কমলা ইজ্জত বাঁচিয়েছে। এবার আমি ওদের সঙ্গে লড়বার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ঘুশি, লাথি, রডের বারি তখন আমার ওপর অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মত নেমে আস্‌ছে। একটু পরেই আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। কখন যেন আমার একটু জ্ঞান ফিরেছিল। আমার কানের কাছে কে যেন বল্‌ল, আর কখনো ওদিকে গেলে তোর লাশ ফেলে দেব।

কারোর মুখে আর কথা নেই। এহেন বক্‌বক্‌ স্বভাবের রমেনও চুপচাপ, হতবাক। জীবন মুখ নীচু করে বসে রয়েছে। গদি ঘরের মধ্যে একটা থমথমে ভাব। জীবন দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

—সেরে ওঠার পর একটা চিঠি লিখে আমাকে এসব কথা জানাওনি কেন?

জীবন সুধায় রামলালকে।

ফোড়ন কাটে ভাইপো।

—সেরে ওঠার পর চিঠি দেবে কি! ভাইয়া বিলকুল অন্য মানুষ হয়ে গেল। বাঙলা স্কুলে ভর্তি হয়ে লিখাপড়া শুরু করল। একটার পর একটা পরীক্ষায় পাশ করতে লাগল। এইত এবছর ভাইয়া বাঙলায় এম-এ পাশ করেছে। প্রফেসর সাব বলেছেন, ভাইয়া সোনার মিডেল পাবে।

রামলালের কাছে ধমক খেয়ে ভাইপো চুপ করে। কিন্তু জীবন ছাড়ার পাত্র নয়।

—এ ব্যাপারে তোমার কি কাউকে সন্দেহ হয় মেজবাবু?

রামলাল হাসে। সরল হাসি।

—বাদ দিন তো জ্যাঠাবাবু ওসব কথা। দাদা, বৌদি, বিশ্বস্রষ্টা কেমন আছে? কতদিন দেখিনি ওনাদের।

—উৎপলকে জলপাইগুড়িতে বদলি করেছে। আদর্শগত ব্যাপারে সহকর্মীদের সঙ্গে ওর প্রায়ই মতভেদ হত। সেই জন্যেই মনে হয় বদলি করেছে। কিছুদিন আগে বৌমার একটা চিঠি পেয়েছিলাম। উৎপল এখন সরকারী চাকরী ছেড়ে যে কোন ছোট চাকরী নিয়ে দেশে ফিরতে চায়।

সবাই আবার চুপচাপ। আবার সেই থমথমে ভাব। রামলাল বার বার তাকায় জীবনের দিকে। কিছু যেন জান্‌তে চায়। কথাটা বল্‌তে পারছে না। সুতরাং ভাইপো। প্রশ্নটা সে ছুড়ে দেয় জীবনের দিকে।

—আপনার লেড়কীর খবর কি?

—কমলা বিধবা হয়েছে।

জীবনের চোখেমুখে হাহুতাসের চিহ্ন নেই। গলার স্বর স্বাভাবিক।

চোখ দুটো বড় বড় করে দু'হাত দিয়ে জীবনের দু কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে রামলাল বলে—সেকি, কবে?

জীবনের চোখে চোখ পড়তেই রামলাল লজ্জিত হয়। হাত দুটো নামিয়ে নেয়। মুখ নীচু করে রামলাল আবার বলে—কোথায় কমলার বিয়ে দিয়েছিলেন?

—ওখানেই! একটা মুসলমান ছেলেকে ও বিয়ে করেছিল। ছেলেটি খুব মেধাবী ছিল। ওখানকার ছেলে কলেজের অধ্যাপক ছিল।

—জ্যাঠাবাবু, এ বিয়েতে আপনি কি মনেপ্রাণে মত দিয়েছিলেন?

—দিয়েছিলাম। কেন দেব না? নিজেদের জাত ধর্মে এমন পাত্র পেলে সব বাপ্‌মাইতো বর্তে যেত। দুটো শিক্ষিত ছেলেমেয়ে যখন একে অপরকে গভীরভাবে চাইছে, ধর্ম তখন বাধা হবে কেন?

—কি করে ম'ল?

ভাইপো কোন রকমে হাসি চেপে জিজ্ঞেস করে।

—মিনি বাসের ধাক্কায়। বিয়ের পর তখন পুরো এক বছরও হয়নি। কলেজ থেকে বাসায় ফিরছিল। সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। বাবাকে আমার চিকিৎসা করার সুযোগই পায়নি।

—কমলা কি এখন আপনার কাছে আছে?

সহানুভূতির সুরে রামলাল জিজ্ঞেস করে।

—না। ওরা দুজনেই নিরিবিলি পছন্দ করত। কমলা যে স্কুলে মাষ্টারী করে, তার কাছে নদীর ধারে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে ওরা সংসার সাজিয়েছিল। সেখানেই কমলা এখন একা থাকে।

জীবনের গলার স্বর বুঁজে আসছে। নিজেকে আর সাম্‌লাতে পারছে না। কিন্তু রামলালের সেসব দিকে খেয়াল নেই। প্রশ্ন করে—আপনি আন্‌তে যাননি?

—গিয়েছিলাম। কমলা আসতে রাজী হয়নি। তাছাড়া সাদা থানের নীচে ফুটফুটে মাকে দেখলে বুকটা আমার ফেটে যায়। আমি—আমি—

জীবনের গলার স্বর জড়িয়ে যায়। কেঁদে ওঠে। হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে। রামলাল জীবনকে শান্ত করার চেষ্টা করে। হাত ধরে

কুটুরি ঘরে নিয়ে আসে। এয়ার কুলার চালিয়ে দেয়। বিশ্রাম নিতে বলে। কিন্তু জীবন কলকাতায় এসেছে অনেক দায়িত্ব নিয়ে। বিশ্রাম নিলে তার চল্‌বে কেন? রামলাল জীবনকে সেদিক দিয়েও নিশ্চিন্ত করে। রমেনের মাল কেনার সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়। রমেনের কাছে ফর্দ চেয়ে নেয়। এখনো অনেক মাল কেনার বাকি। রামলাল নানা জায়গায় টেলিফোন করতে শুরু করে। আগমার্কা সরষের তেল জীবন পাঁচ টিন কিনেছিল। কিন্তু জীবন যে দরে কিনেছিল, রামলাল তার থেকে টিনে দুটাকা কম দরে আরও পঁচিশ টিন কেনে। রমেন চম্‌কে ওঠে।

—এত তেল কি হবে? এত টাকাই বা কোথায়?

—তেলের টাকা পনেরো দিনের মধ্যে দিলেই চল্‌বে। সরষের তেলের দাম বাড়বে। আগামী সপ্তাহে তেল কিনে খুচরো বেচারও পর্তা থাকবে না। আগে পরের মাল না থাকলে দোকান জমান যায় না।

রামলালের আশ্বাসে রমেন শান্ত হয়। চড়কির মত টেলিফোন ডায়াল ঘুরে চলেছে। জিরে, সরষে, মৌরা, সুপারী ফর্দের সব মাল রামলাল কিনে ফেলে। রমেন কিন্তু শান্তি পাচ্ছে না।

—দাদা, জিরেটা আর একটু কমে হ'ল না?

বোকার মত রমেন বলে।

রামলাল হাসে।

—শুধু দামের দিকে তাকালেই হয় রমেনবাবু! মালের কোয়ালিটিও তো দেখতে হবে। মণে পাঁচ টাকা বেশী নিলেও রকেট মার্কা জিরেটাই এখন বাজারের সেরা। তাই কিনে ফেল্‌লাম। দেখুন রমেনবাবু, কিছু কম দাম হলেও কোন সময় দু নম্বর মাল কিনবেন না। দু' পয়সা বেশী হলেও সব সময় এক নম্বর মাল কিনবেন। ভেজাল যদি দিতে চান সেটা আলাদা কিনে নেবেন। কিন্তু ভেজাল মাল কিনবেন না।

—ভেজালও কিন্‌তে পাওয়া যায় নাকি?

অবাক হয়ে রমেন বলে।

আবার ফোড়ন কাটে ভাইপো। কালির দোয়াতে ফোঁটা ফোঁটা জল দিতে দিতে সে বলে—কলকাতায় কিনা পাওয়া যায়! সরষের তেলের জন্যে তিসির তেল, হোয়াইট অয়েল, পোড়া মবিল। মুশুর ডালের জন্যে হেট্‌কা। মুগ ডালের জন্যে মঠডাল, ছোট দানার সাদা পাথর, জিরের জন্যে মৌরীর চাল, জিরলি, রঙ্‌ করা সিমেন্টের জিরে। সব মালের ভায়রাভাই পাওয়া যায়। যেমন দরকার বুঝবেন তেমনি কিনবেন।

আরামবোধ হলেও জীবন কুঠুরি ঘরে বেশী সময় থাকতে পারে না। নানা কথা, নানা স্মৃতি তাকে ছিন্নভিন্ন করতে থাকে। চোখের জল কিছুতেই থাম্‌তে চায় না। জীবন বিকেলের ট্রেনে ফেরার ঠিক করে। টাকা পয়সা রামলালের হাতে জমা দিয়ে জীবন শেয়ালদার দিকে পা বাড়ায়। কিন্তু পোস্তা থেকে শেয়ালদা পৌঁছাতে জীবনের পাকা দেড় ঘণ্টা লেগে যায়, যানবাহনের জটের ঠেলায়। জীবন যে ট্রেনটা ধরার ঠিক করেছিল সেটাত পাবেই না, পরেরটা পাবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু পরের ট্রেনটা লেট আছে। ছ' নম্বর প্ল্যাটফর্মে তাই দারুণ ভিড়। যে যত ভাল লড়তে পারবে, পাষণ্ড হতে পারবে, সেই তত ভাল বসার জায়গা পাবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেন আসে। ট্রেনটা পুরোপুরি থামার আগেই এমন হুড়োহুড়ি লেগে যায় যেন জালিয়ান-ওয়ালাবাগে ইংরেজ পুলিশের গুলি চালনা শুরু হয়েছে। রমেনের লড়বার শক্তি নেহাত কম নয়। বহু নারী পুরুষকে মারিয়ে চট্‌কিয়ে গুঁতিয়ে রমেন বসার জন্যে একফালি জায়গা দখল করেছে। জীবন রমেনের জায়গায় বসে, রমেন দাঁড়িয়ে থাকে। যেমনি গরম তেমনি গুমোট। ঘেমে তোল-ঘাম। ট্রেনটা ছাড়লে বাঁচা যায়। অনেকটা সময় কেটে গেল, ট্রেন ছাড়ার নাম নেই। শিশুর কান্না। বড়দের হাহুতাশ। ঝগড়াঝাটি। চেঁচামেচি। সব মিলিয়ে খাঁটি নরক। মাইকে কি যেন বলছে! সবাই চুপচাপ। কান খাড়া।

—ছ' নম্বর প্ল্যাটফর্মের গাড়ি খারাপ আছে। যাত্রীরা কেউ

ঐ গাড়িতে উঠবেন না। বনগাঁ লোকাল চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে এখুনি ছাড়বে।

ছোট্। ছোট্। হাতে স্যুটকেশ। দু হাতে দু' ব্যাগ বোঝাই মাল। মাথায় বেডিং। যার যা আছে তাই নিয়ে ছুটছে। কে কত জোরে সামনের লোককে কত নির্দয়ভাবে ধাক্কা মারতে পারে। অল্প জায়গার মধ্যে কে কতটা নিজের শরীরটাকে শাপের মত আঁকাবাঁকা করতে পারে। এখন তারই প্রতিযোগিতা চলছে। ছুটন্ত রাজধানী এক্সপ্রেসের হুইসিলের মত জীবন রমেনের নির্দেশ শোনে।

—কাকু জায়গা রাখছি; তাড়াতাড়ি চলে আসুন।

জীবনের বয়স হয়েছে। বাজারে যথেষ্ট হাঁটাহাঁটি করেছে। ট্রামেবাসে ধস্তাধস্তি করেছে। পরিশ্রম হয়েছে। তবু যতটা পারে তাড়াতাড়ি চার নম্বরে হাজির হয়। কিন্তু রমেন কোথায়! চিৎকার করে জীবন ডাকে রমেনকে। কোথায় রমেন! জীবন নিজেই নিজের গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে না। তার চেয়ে অনেক বেশী জোরে হাজার লোক চিৎকার করছে। মাইকের ঘোষণা। প্রচণ্ড ঘড়ঘড় শব্দে ঠেলার মাল টানা। ইলেকট্রিক ট্রেনের হর্ণ. সব মিলিয়ে ইডেন গার্ডেনে ইষ্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের কোন ফাইনাল খেলার শেষ মুহূর্তে গোল শোধের অবস্থা। জীবন ডাকাডাকির চেষ্টা ছাড়ে। ট্রেনের পাশ দিয়ে পায়ে পায়ে হেঁটে চলে। যদি রমেনের দেখা পাওয়া যায়। প্ল্যাটফর্মে আলো থাকলেও ট্রেনের ভেতরটা অন্ধকার। রমেন যদি জীবনের চলার উল্টো পাশে থাকে, তবে তার দেখা পাওয়া অসম্ভব। তবু হাঁট্তে হয় হাঁট্ছে। কাকু! রমেন ডাকল না! কাকু বলল না কাকী বল্ল! জীবন কাকু না হয়ে কাকী হলে! 'কাঁকে একটা বাচ্চা থাকলে! জীবন শিউরে ওঠে। কাকু! জান্লার গরাদে মুখ লাগিয়ে রমেন ডাকছে। রমেন এবার জান্লার ধারে জায়গা দখল করেছে। কিন্তু এত ভীড় ঠেলে রমেনের কাছে যেতে জীবনের প্রবৃত্তি হয় না। পাদানিতে উঠে কোন রকমে দাঁড়িয়ে থাকে। জীবনকে না দেখে রমেন চেঁচামেচি করে।

—তোমার কাছে যাই কি করে! দারুণ ভীড় যে!

বিরক্ত হয়ে জীবন বলে।

—শরীরটাকে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে নাড়াচাড়া করুন, পেছনের লোক ঠেলে আপনাকে এখানে পাঠিয়ে দেবে।

রমেন জীবনকে উপদেশ দেয়।

জীবন রমেনের কথার কোন উত্তর দেয় না। আগের মতই দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু রমেন ছাড়ার পাত্র নয়।

—কাকু, ওখানে দাঁড়াবেন না। লোকে আপনার কাঁধে নাক মুছবে।

জীবন না হেসে পারে না। মাত্র ঘণ্টা দুই আগে যে লোকটা শোকে দুঃখে ছিন্নভিন্ন হচ্ছিল, চোখের জল যার থামতেই চাচ্ছিল না, সেই জীবনের মুখেও হাসি ফুটেছে। ধন্য ভারতীয় রেল। ধন্য শেয়ালদা ষ্টেশন।

কিন্তু একি! মাইকে আবার কি যেন ঘোষণা করছে! সবাই চুপচাপ। কান খাড়া। ছ' নম্বর প্ল্যাটফর্মের গাড়ি ঠিক হয়ে গেছে। বনগাঁ লোক্যাল ছ' নম্বর থেকে এখুনি ছাড়বে। চার নম্বরের গাড়ি সাইডিঙে যাবে। জীবন কিছু বোঝার আগেই রমেন জীবনের পাশ কাটিয়ে উল্কার বেগে ছুট দেয়। জীবন আগের গতিতেই ছ' নম্বরের দিকে চলেছে। নানা লোকের নানা মন্তব্য শুনে জীবন না হেসে পারে না। দু' হাতে দুটো ভারি ঝোলা নিয়ে ঠ্যাং দুটোকে ফাঁক করে যে লোকটা ছুট্‌ছে তার অকথ্য বাঙলা ভাষা শুনে জীবন এত জোরে হেসে ওঠে যে আর একটু হ'লে পড়ে যেত। সামনের সীটে পা তুলে রমেন এবার জান্‌লার ধারে সামনাসামনি দুটো সীট দখলে রেখেছে। ট্রেনটায় আলো ছিল। বহু কষ্টে জীবন বস্‌তেই দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা ফোঁস করে ওঠে!

—আপনি যে বল্‌লেন, আপনার বুড়ি মা আসছেন! ইনিই কি আপনার বুড়ি মা?

রমেন জবাব দিতে দেরী করে না।

—হ্যা, মাতো বুড়ি, আস্‌তে আসুতে আস্‌ছেন। ইনি আমার বুড়ো বাবা।

জান্‌লার দিকে মুখ করে রুমাল চেপে জীবন হাসে। আজ অবধি কখনো সে এত হেসেছে বলে মনে পড়ে না।

প্রচণ্ড শব্দে একটা হর্ণ। ছোট্ট একটা ঝাঁকুনি। দেড় ঘণ্টা লেটে হলেও ট্রেন ছেড়েছে।

প্রথম কয়েকটা ষ্টেশন ভালই ছুটল ট্রেনটা। তারপরই ধরল শামুকের গতি। একটু করে যাচ্ছে আর থামছে। সামনের সীটগুলো জুড়ে কয়েকটা ছোক্‌ড়া দিব্যি তাসের আড্ডা জমিয়েছে। ট্রেন চলা না চলার ব্যাপারে ওদের কোন মাথা ব্যথা নেই। মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে বেশ রসিকতা করছে। এত কথাও জানে ওরা। তাসের দিকে দৃষ্টি রেখে একজন বলে—হ্যারে, শালার ট্রেনত থেমে রয়েছে মনে হচ্ছে!

জবাব আসে সঙ্গে সঙ্গে।

—থাম্‌বেই ত। এটা যে মেল ট্রেন!

—মেল ট্রেন যেখানে সেখানে থামে নাকি! তোর মাথায় শালা গোবর আছে।

—আমার মাথায় যদি গোবর থাকে, তোর মাথায় ভেড়ার নাদি আছে। লোক্যাল ট্রেন সব ষ্টেশনে থামে। আর যে ট্রেন সব ষ্টেশনের আগে এবং পরে থামে, কিন্তু ষ্টেশনে থামে না, তাকেই আধুনিক মেল ট্রেন বলে। আধুনিক গানগুলো দেখিস না, হতে হতে ধাঁ করে থেমে যায়। মনে হয় রেকর্ডটা খারাপ হয়ে গেল। তারপরই গলায় এমন প্যাঁচ মারে যে মাজা আপনিই দুলে ওঠে।

ট্রেনটা আবার ঝাঁকুনি মেরে চল্‌তে শুরু করে।

—বল্‌ত ভেড়া, এবার কেমন আনন্দ পাচ্ছিস?

জীবন গরমে কষ্ট পেলেও ছেলেগুলোর কথা ওর ভালই লাগছে। ট্রেনটা কিছুক্ষণ আস্তে আস্তে গিয়ে একটা ছোট ষ্টেশনে থামে। এবার

থেমেছে তো থেমেছে। নড়ার আর নাম নেই। লেটে ছাড়লেও ট্রেনটা ঠিকমত গেলে জীবন এতক্ষণ বাড়ী পৌঁছে যেত। কামরার চারিদিকে ডেলিপ্যাসেঞ্জাররা তখনো তাস খেলে যাচ্ছে। ট্রেন না চলার জন্যে ওদের না আছে কোন অভিযোগ না আছে কোন মাথা ব্যথা। যায় যাক্ না যায় না যাক্। জাহান্নমে গেলেও ওরা তাস খেলে যাবে। ট্রেনটার হ'ল কি! রমেন গিয়েছিল খবর জান্তে। যাত্রীরা কোথায় লাইন অবরোধ করেছে। দাবী না মিটলে ট্রেন যেতে দেবে না। রমেনের খিদে পেয়েছিল। ও যায় হোটেলের খোঁজে। জীবন বসে বসে তাস পার্টিদের ঠাট্টাচালাকি শোনে।

—বেশত বাবা ছিলি। প্রাইমারী স্কুলে মাষ্টারী করছিলি! অর্দ্ধেক দিন যেতিস; অর্দ্ধেক দিন যেতিস না। গরমের ছুটি, পূজোর ছুটি, হেড মাষ্টারের গরু মরার ছুটি। ছুটি আর ছুটি। সুখে থাকতে ভুতে কিলাল। চাকরী করতে কলকাতায় এলি। এবার বাছা ঠেলা বোঝ!

আর একজন ফোড়ন কাটে।

—ও শালা মাষ্টারী ছাড়ত নাকি! ফুলশয্যার রাতে ওর বৌ এমন এক গল্প ফেঁদেছিল যে ঘেন্নায় ও মাষ্টারী ছাড়ল।

হৈ হৈ করে সবাই বলে—বল মাইরী বল।

ওরা যার পেছনে লেগেছে সে সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস করে ওঠে।

—দেখ, হয় মন দিয়ে খেল্ নতুবা চাটিবাটি গুটা।

মুখের মধ্যে আঙুল দিয়ে বিকট একটা শব্দ করে আর একজন বলে—বেঁধেছে। এতক্ষণে যন্তর পাওয়া গেছে। বল্ মাইরী বল্!

নিজের আধ খাওয়া বিড়িটা ওর মুখে লাগিয়ে দিয়ে আবার বলে—এইনে বিড়ি খা।

ছেলেটা বিড়িতে একটা সুখটান দেয়।

—বছর কয়েক আগে এশিয়ান গেম্‌সে একটা ভারতীয় মেয়ে রাণে ফার্ষ্ট হয়েছিল, মনে আছে? ঐ মেয়েটা। আমি শালা ওদের ফুলশয্যার

রাতে খাটের নীচে টেপরেকর্ডার রেখে সব কেচ্ছা টেপ করে নিয়েছিলাম।

—দূর শালা খেলব না।

ছেলেটা হাতের তাসগুলো ছুড়ে ফেলে উঠতে যায়। জাপটে ধরে সামনের ছেলেটা।

—শালা যাবি কোথায়! শুনে যেতে হবে। কাল সকালে এই ট্রেনেই আবার কলকাতা ফিরতে হবে।

সবাই মিলে জোর করে ওকে ওর জায়গায় বসিয়ে দেয়।

—তুমি শালা বোয়ের সঙ্গে কেচ্ছা করবে, আর ও বল্‌লে যত দোষ! বল্‌ মাইরী বল্‌।

—সেই মেয়েটা কি করে ফার্ষ্ট হয়েছিল জানিস! বলছি কিন্তু।

ছেলেটার থুত্‌নীটায় নাড়া পড়ে। ছেলেটা রাগ করে উঠতে যায়। সবাই মিলে আবার ওকে থাবড়িয়ে বসিয়ে দেয়।

—বল্‌ মাইরী বল্‌।

—ওর বৌ ওকে বলেছিল, সেই মেয়েটা দৌড় শুরু করার ঠিক আগে কানে কানে কোচ নাকি বলেছিল, দেশে তার বাবা একটা প্রাইমারী মাষ্টারের সঙ্গে তার বিয়ের ঠিক করেছে। রাগে, ঘেন্নায়, পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার জন্যে মেয়েটা এত জোরে ছুটেছিল যে ফার্ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেই ঘেন্নায় ও মাষ্টারী ছেড়েছে।

জীবনও অল্প বয়সী ছেলেগুলোর সঙ্গে চিৎকার করে হেসে ওঠে। ধন্য ভারতীয় রেল। বুড়ো-বুড়ি, ছোড়া-ছুড়ি, দুঃখী-সুখী, সবাইকে সমান করে দেবার ক্ষমতা একমাত্র তোমারই আছে।

ষ্টেশনের কাছেই একটা হোটেল। রমেন সেখান থেকে তোফা মাছ ভাত খেয়ে আসে। জীবনেরও খিদে পেয়েছে। সেও যায় দুটো মাছ ভাত খেতে। গরম গরম মাছ ভাত জীবন পেট ভরে খেয়েছে। এমন তৃপ্তি করে সে অনেকদিন খায়নি। এত খিদেও তার বহুদিন পায়নি। হাতে একটা সিগারেট নিয়ে পান চিবোতে চিবোতে জীবন ট্রেনে ফেরে। বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। ট্রেন চলুক আর না চলুক

জীবন এখন ঘুমিয়ে বাঁচ্‌বে। কিন্তু রমেন দিল জীবনের মাথাটা গরম করে। বার বার রমেন কখনো রাজ্য সরকার কখনো কেন্দ্রীয় সরকারকে গালাগালি করছে। ধমক দিয়ে জীবন বলে—বড় বাজে কথা বল্‌ছ রমেন। এ ব্যাপারে সরকার কি করবে? দেশের অধিকাংশ মানুষই দায়িত্ব জ্ঞানহীন আর অসৎ। অসৎ লোকদের দিয়ে কখনো কোন সুশৃঙ্খল কাজ হতে পারে না। আমরা বুঝি না যে আমাদের অপরাধের কুফলটা আমাদেরই বইতে হবে। আমরা মন্দির, মস্‌জিদ, গীর্জা তৈরী করে সেখানে পূজো দিই। দান করি। কিন্তু গণতান্ত্রিক উপায়ে সরকার তৈরী করে সব দিক দিয়ে তাকে ধ্বংস করার পথ তৈরী করি। আসলে অসাধুতার ব্যাপারে আমরা সবাই এক পার্টি।

জীবন যখন বাড়ী পৌঁছায়, তখন ভোর হতে আর বেশী দেরী নেই। জীবনের এখন ঘুমলে চল্‌বে না। রমেন ছেলে মানুষ। অনভিজ্ঞ। জাবন দোকানে না থাকলে মালপত্র ঠিক মত হিসাব করে লরি থেকে নামাতে পারবে না। এতটুকু ভুল হলেই সর্বনাশ। না ঘুমিয়ে সকাল সকাল দোকানে চলে আসতে জীবন বার বার রমেনকে বলে দিয়েছে। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিজের হাতে তৈরী করে চা খেয়ে জীবন অনেক দিন পরে গড়গড়া ধরায়। জীবন যখন ব্যবসা করেছে, তখন যদি ট্রেনের এমন অবস্থা হ'ত, অনেক আগেই তাকে তাহলে ব্যবসা থেকে বিদায় নিতে হ'ত। যারা একা দোকানদারী করে, সারাদিন রোদে জলে গরমে হেঁটে হেঁটে মাল কেনে; তাদের শরীরের যে কি অবস্থা হয়, জীবন তা ভালই জানে। তারপর সারারাত না ঘুমিয়ে সারাদিন দোকানদারী যে কি মারাত্মক জীবন তাও বোঝে হাড়ে হাড়ে। ভাবতে ভাবতে জীবনের চোখে জল এসে যায়।

জীবন যা ভেবেছিল তাই হয়েছে। বেশ সকাল সকাল লরি এসে গেছে। রমেনের দোকানের সামনে লরিটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওপরেই রমেনের মাল। তাড়াতাড়ি মালগুলো নামিয়ে নেওয়া দরকার।

মাল কাঁটা করে মিল করে লাট্ দিতে সময় লাগে। কিন্তু রমেন এখনো আসেনি। সকালে মালগুলো নামিয়ে নিতে পারলে ঝামেলা অনেক কম হয়। এরপর বাজার ফিরতি মানুষ, ঠেলা, রিক্সা, লরি, গাড়িতে খেচাখেচি লেগে যাবে। ড্রাইভার জীবনকে অনেকদিন চেনে। সম্মানও করে যথেষ্ট। দু একবার অনুরোধ করেছে মালগুলো নামিয়ে নিতে। ভাড়া বিকেলে দিলেও চল্বে। কিন্তু রমেন এখনো আসেনি। দোকান থেকে ভূদেবের বাড়ী অনেকটা দূর। খবরই বা পাঠায় কি করে। রাস্তায় ভিড় বাড়ছে। জীবন আর অপেক্ষা করতে পারে না। একটা রিক্সা নিয়ে রমেনের বাড়ী ছোটে। রিক্সায় বসেই জীবন ভূদেবকে ডাক দেয়। রমেনকে ডেকে দিতে বলে। মাল এসে গেছে। কিন্তু রমেন ঘুমচ্ছে। বাড়ীর ভেতর থেকে রমেনের মা ঝাঁঝিয়ে ওঠে।

—সারারাত বাছা জেগেছে। এখন ঘুমোচ্ছে। একদিন একটু দেরী করে দোকান খুল্লে এমন কিছু সর্বনাশ হবে না। ও তো মহাজনের গদির চাকর নয়!

ভূদেব স্ত্রীকে চুপ করতে বলে। কিন্তু জবর তাড়া খায়। জীবনের কাছে পালিয়ে আসে।

জীবন শান্তভাবে ভূদেবকে সব কথা বুঝিয়ে বলে। ভূদেব রমেনকে ডেকে দেয়।

কিভাবে মাল মিল করে নামাতে হয়। কিভাবে দাগে দাগ মিলিয়ে মাল লাটে দিতে হয়। কিভাবে লরির নাম্বার, তারিখ লিখে মাল খাতায় জমা করতে হয়। লরি চালানে কিভাবে মন্তব্য লিখে দিতে হয়। সব কিছুই শিখতে হয়। ব্যবসায়ে কুড়েমির কোন স্থান নেই। শরীরকে সুস্থ রেখে যত বেশী খাটতে পারা যাবে, তত তাড়াতাড়ি উন্নতি হবে। জীবন উপদেশ দেয় রমেনকে।

গতকাল শেয়ালদা ষ্টেশন থেকে বাড়ী ফেরা পর্যন্ত ভারতীয় রেলের ঠেলায় উদয় মারা যাবার প্রচণ্ড শোকটা জীবনের মধ্যে অনেকটা চাপা

পড়ে গিয়েছিল। আজ সকাল থেকে দৌড়াদৌড়ি আর ব্যস্ততার জ্বালায় বাকিটুকুও ঘুচে গেল। জীবন রমেনকে টাটে বসিয়ে মালের হিসাব বুঝিয়ে দেয়। ষ্টক খাতা তৈরী করে। বাড়ীর ফেরার সময় সে একদম আলাদা মানুষ। জীবন আবার আগের দিনগুলোকে যেন খুঁজে পেয়েছে। সেলুনে গিয়ে দাড়ি কামায়। হোটেলে গিয়ে পেট ভরে খায়। দুপুরে টানা একঘুম দিয়ে বিকেলে যায় কমলার বাসায়। বাপ্‌কে দেখে কমলাত অবাক। কি ব্যাপার! রাতারাতি বাপী চেহারাটাকে একদম পাল্‌টিয়ে ফেলল কি করে! মাত্র ক'দিন আগে বাপের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে কমলা দারুণ ঘাবড়ে গিয়েছিল। মনে মনে ঠিক করেছিল যেমন করেই হোক বাপীকে এ বাড়ী থেকে নিয়ে যেতে হবে। নইলে একা একা মন গুম্‌ড়ে গুম্‌ড়ে বাপীটা তার এক ফোঁটা জল না পেয়ে মরে যাবে। কিন্তু জীবন কিছুতেই কমলার সঙ্গে যেতে রাজী হয়নি। হঠাৎ সেই বাপের এমন পরিবর্তন হ'ল কি করে! তাবিজ, কবজ ধারণ করেনি তো! কমলা জানে না ভারতীয় রেল মার্কা জলপড়ার কতগুণ। একদিনের এক ডোজে মানুষের সব সুখ-দুঃখ-শোক নির্মূল হয়ে যায়। বিরক্তি যুগ যুগ জিও।

অনেক রাত অবধি বাপ মেয়েতে অনেক কথা হয়। কমলা নিজের হাতে রান্না করে জীবনকে খাওয়ায়। জীবন সব কিছু বেশ তৃপ্তি করে খায়।

রমেনের দোকানের প্রায় সব দায়িত্ব জীবন নিজেই নিজের কাঁধে তুলে নেয়। মেমো কাটা। ষ্টক খাতা ঠিক রাখা। রেট বোর্ড, ষ্টক বোর্ড, সব কিছুর দিকে জীবনের সজাগ দৃষ্টি। কর্মচারীতে মাল মাপে। রমেন ফর্দ করে, ক্যাশ নেয়। জীবন সারাদিন খাতাপত্র, কাগজপত্র, বিভিন্ন রিটার্ণ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। জীবন রমেনের পয়সায় কোনদিন এক কাপ চাও খায় না। কিন্তু দায়িত্ব বোধের ব্যাপারে এতটুকু ফাঁকি নেই।

সারাদিন জীবনের ব্যস্ততা। দেখলে মনে হয় ভূদেব রমেনের দোকানের জন্যে একগাদা টাকা মাইনে দিয়ে ম্যানেজার রেখেছে।

আজকাল কাজ করতে জীবনের খুব অসুবিধা হয়। সন্ধ্যেটি হলেই আলোটি নিভে যায়! কখন যে জ্বলবে তার কোন ঠিক নেই। মশার কামড়ে আর দারুণ গরমে মোমবাতি কিম্বা হ্যারিকেনের আলোতে খাতাপত্র হিসাব নিকাশের কাজ করা কষ্টকর। কিন্তু সারাদিন বেচাকেনার পরই খাতাপত্র ঠিক করতে হয়। নতুবা আইন অনুযায়ী ষ্টক বোর্ড ঠিক রাখা যায় না। আজকাল দিনের বেলাতেও প্রায় রোজই কারেন্ট থাকে না। সুতরাং কাজ করার সমস্যা দিন দিনই বাড়ছে। বিদ্যুৎতের দাম বাড়ছে। বিলে টাকার অঙ্ক বাড়ছে। খরচ বাড়ছে। দ্বিগুণ। তিনগুণ। কিন্তু কাজের কোন নিশ্চয়তা নেই। জীবন মুখ গোমড়া করে। রমেন কথা বলে।

—কাকু একটা কাজ করব? মিটারে একটা কায়দা করে দেব? কারেন্ট থাকলে আলো জ্বলবে, ফ্যান ঘুরবে; কিন্তু মিটার উঠবে না। আজকাল অনেকেই এসব করছে।

জীবন চমকে ওঠে।

—সেকি কথা! তারপর অফিসের লোক এসে ধরলে! জেল খাটবে কে?

রমেন এতটুকু বিচলিত নয়!

—ধরতে পারলে মাসে মাসে টাকার রফা করে নিলে আর কিছু বলে না। তাতেও অনেক লাভ থাকে কাকু। সত্যি করে ধরলে দেশের বেশীর ভাগ লোক্‌কেই জেলে যেতে হবে! অত জেলই বা কোথায়, জেলে অত জায়গাই বা কোথায়!

—না। কোন অন্যায় কাজ করবে না।

জীবনের গলা দিয়ে আগুন বেরিয়ে আসে।

রমেনের মনোভাবে জীবন আন্‌মনা হয়ে যায়। তাইতো দেশটা চলেছে কোথায়! বিরাট সমাজ-পাহাড়টা কি কোনদিন আগ্নেয়গিরি হবে না! হোক। হোক। যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল। কড়া চোখে জীবন বার বার তাকায় রমেনের দিকে।

প্রতি পনেরো দিন অন্তর বিশেষ কয়েকটা জিনিসের বেচাকেনার হিসাব ফুড কণ্ট্রোলার অফিসে দোকানদারদের জমা দিতে হয়। সেদিন বেলা দশটার পর থেকে লোডশেডিং। জীবন চাল, ডাল আর তেলের হিসাবপত্র জমা দিতে এসেছিল কণ্ট্রোলার অফিসে। দশটায় অফিস খোলার কথা। জীবন তাই এগারোটায় দোকান থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে রিটার্ণ জমা দিতে এসেছে। অফিসটা কে যেন খুলেছে। কিন্তু চেয়ার সব ফাঁকা। অফিস আজ ছুটি নয়ত! জীবন যে কাউকে জিজ্ঞেস করবে তারও কোন উপায় নেই। ধারে কাছে পাত্তাই নেই কোন মানুষের। জীবন ভয় পায়। কিরে বাবা, চোর বলে ধরিয়ে দেবে না তো। না, তা মনে হয় দেবে না। এদের সঙ্গে জীবনের এখনো আড়ি হয়নি। মানে ঝগড়া হয় নি। জীবন ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে। সামনের বাড়ীর ছাদে হনুমানগুলো কি সুন্দর খেলা করছে। বাচ্চাদের ওপর কি দারুণ যত্ন ওদের। সেই কোন্ সকালে নিজেদের বসবাসের গাছটা ছেড়ে ওরা লোকালয়ের দিকে চলে এসেছে খাদ্যের সন্ধানে। ওরা যাই করুক, এ ছাদ থেকে ও ছাদে যতই লাফাক, পালের গোদাটিকে কিন্তু সবাই ভয় করে। জীবন ওদের মজা দেখে। সিঁড়িতে জুতোর শব্দ। জীবন হাত ঘড়ির দিকে তাকায়। সাড়ে এগারোটা। যে ভদ্রলোককে জীবনের দরকার ইনি তিনি নন। ইনি স্বয়ং কণ্ট্রোলার সাহেব। এনাকে দিয়ে জীবনের কাজ হবে না। অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। আস্তে আস্তে বাবুরা অবশ্য আসছেন। জীবনের যাঁকে প্রয়োজন সেই বাবু এলেন বেলা বারোটায়। যুবক

ছেলে। স্বাস্থ্যবান। জীবন বৃদ্ধ হয়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছে। কেরানীবাবু চেয়ারে বসার সঙ্গে সঙ্গে জীবন রিটার্ণটা টেবিলের ওপর রেখে পিয়ন বইটা খুলে দেয়। রুমাল দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে কেরানীবাবু ভ্রু-কুঁচকান।

—কি এ সব?

—চাল, ডাল, তেলের পাক্ষিক রিটার্ণ। দয়া করে জমা করে নিন।

—রাখুন এসব। গরমে মরে যাচ্ছি। ফ্যান চলুক তারপর দেখা যাবে।

কেরানীবাবু ঝাঁঝিয়ে ওঠেন।

—ফ্যান না চলা অবস্থায় আমি এগুলো এই বয়সে তৈরী করতে পারি, আর আপনি নিতে পারবেন না?

জীবনের গলার স্বরে বিদ্রূপ মেশানো।

—তার জবাব আপনাকে দিতে হবে নাকি?

কেরানীবাবু জ্বলে ওঠেন। যেন ঘরের মধ্যে বোমা ফাটে। কাগজগুলোকে হাত দিয়ে দূরে ঠেলে দিয়ে কেরানীবাবু আবার বলেন—নিয়ে যান এসব। যখন ডাকব তখন আসবেন।

সব জিনিসের মত ধৈর্যেরও সীমা আছে। জীবন বল্লমের খোঁচা খাওয়া বাঘের মত গর্জে ওঠে।

—আমি আপনার মাইনে করা চাকর নই। এখুনি এগুলো আপনাকে নিতে হবে। বেলা বারোটায় আসবেন, মানুষের সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করবেন; ভেবেছেন কি আপনারা?

আশপাশ থেকে কয়েকজন ছুটে আসে। জীবনকে ধমক দেয়।

—এখানে চিৎকার করছেন কেন? মস্তানী করার জায়গা পান না? এটা অফিস।

সবাই মিলে ঠেলতে ঠেলতে জীবনকে আবার ঝুল বারান্দায় বের করে দেয়। ঘরের মধ্যে এক কোণে টুলের ওপর বসা আধাবাবু ধরণের একজন বলে— ওর দোকানটা কোথায়? ঠিকানাটা জেনে নিন।

আগেকার দিনের দোকানদারীর সঙ্গে বর্তমান যুগের যে অনেক তফাৎ হয়ে গেছে জীবন তা ভালভাবেই বুঝতে পারছে। প্রতিদিন চাঁদার অত্যাচারে জীবন অতিষ্ঠ। কার বাপ মরেছে চাঁদা চাই। কার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না। কে বই কিনতে পারছে না। কার পরীক্ষায় জমা দেবার টাকা নেই। কার টিবি হয়েছে। কত রকমের চাঁদা আর সাহায্য যে আছে জীবন ভেবে পায় না। পূজো এলে রমেন ভয় পায়। চাঁদা তো আছেই তার ওপর দরিদ্র নারায়ণ সেবা। এক মণ চাল চাই। এক বস্তা ডাল চাই। এক টিন গুড় চাই। সবার সব দাবী মেটাতেই হয়, নতুবা নানা অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয় দোকানদারকে। ক'দিন আগে এই পট্টির একটা ছেলের বাপ্ মরে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা ছেলে একটা সরা কিনে বেরিয়ে পড়ে। এক টাকার কমে ওরা সাহায্য নেবে না। কিন্তু রমেনের সামনের দোকানদারটা কিছুতেই পঞ্চাশ পয়সার বেশী দেবে না। ক'দিন ধরে বাজার দারুণ মন্দা। বেচাকেনা নেই! সারাদিনে পেটের ভাত হচ্ছে না। আরও কত লোককে কত রকমের সাহায্য দিতে হচ্ছে। দোকানদারটা নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে। কিন্তু কে কার বোঝ নিচ্ছে। ছেলেগুলোর এক কথা। হয় এক টাকা নেবে, নতুবা দেখে নেবে। পরের দিন সকালে দোকানদারটা দোকান খুলতে এসে অবাক। দোকানে কারা গু দিয়ে গেছে। কাদের খাটা পায়খানার পোকা সমেত নাদা ঢেলে দিয়ে গেছে। দোকানের দরজা, রোয়াক, তালা কোথাও হাত দেবার উপায় নেই। মেথর ডেকে দোকানদারটা পরিষ্কার করতে ব্যস্ত। নাকে রুমাল দিয়ে পথচারী থম্‌কে দাঁড়ায়। হাস্‌ছে। দোকানদারের সম্বন্ধে হাসির মন্তব্য করছে। করবেই তো! দোকানদারের পয়সাটা পয়সা নাকি! ওদেরও চোখের জল মানুষের মত নোন্‌তা নাকি! জীবনের ভেতরটা জ্বলে যায়।

যে কোন নির্বাচন এলে তো দোকান বন্ধ রাখতে ইচ্ছে করে। নির্বাচন তহবিল, বন্যাত্রাণ তহবিল, শিশুস্বাস্থ্য তহবিল কত রকমের

তহবিল কত হোমড়া-চোমড়া নেতার মাথা দিয়ে যে গজিয়ে ওঠে জীবন তার হিসাব করে উঠতে পারে না। চাঁদার অত্যাচারের বিরুদ্ধে কিছু একটা করার জন্যে জীবন একদিন কয়েকজন দোকানদারের সঙ্গে কথা বলতে যায়। তারা কিন্তু অন্য কথা বলে। তাদের মতে পরিস্থিতি এখন নাকি অনেক ভাল। কয়েক বছর আগে কোন রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে টাকার দাবী সমেত চিঠি আসত। নির্দিষ্ট দিনে ঠিক জায়গায় টাকা পৌঁছে দিয়ে আসতে হ'ত। টাকা না দিলে দিনে দুপুরে জনবহুল রাস্তার ওপর লাশ পড়ে যেত। ঐ সময় কত দোকান-দারের পুঁজি যে শেষ হয়ে গেছে তার হিসাব নেই।

দুর্গা পূজোর আর বেশী দেরী নেই। রমেন এ বছর বাপ-মা, ভাগ্নে-ভাগ্নীদের জামা কাপড় দিতে চায়। কিন্তু ক'মাস ধরে মুদিখানার ব্যবসা করে জমার ঘরে প্রায় কিছু নেই বললেই চলে। রামলাল একগাদা টাকার মাল পাঠিয়েছে। পূজোর সময় মালের দাম বাড়তে পারে। রামলালকে কিছু টাকা পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। কিন্তু রমেনের অদ্ভুত আবদার। পূজোর সময় ভাল বেচাকেনা হবে। লাভও ভাল হবে। সুতরাং এখন যদি পুঁজির থেকে পূজো বাবদ দুই-এক হাজার টাকা খরচ হয়, পূজোর সময় সেটা আবার পূরণ হয়ে যাবে।

এদিকে কর্মচারী ইউনিয়নের নেতা চিঠি দিয়েছে। পূজো বোনাসের ব্যাপারে আলোচনা করার জন্যে। মিটিং-এর দিন সব দোকানদার মিলে জীবনকে তাদের নেতৃত্ব করার জন্যে অনুরোধ করে। কিন্তু কর্মচারী নেতা জীবনকে দোকানদার বলে মানতে রাজী নয়। জীবন সম্বন্ধে কর্মচারী নেতার মনোভাব খুবই খারাপ। কর্মচারী নেতার মতে জীবন শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী লোক।

—মুখে উনি মার্কসবাদী, তলায় তলায় করেন বাঁটাবাঁটি।

যুবক কর্মচারী নেতা জীবনকে টিট্‌কারী মারে।

জীবন হাসে। নাতির দুষ্টুমিতে দাদুর হাসি।

দোকানদাররা আজ না-ছোড়-বান্দা। এ বছর তাদের হয়ে জীবনই কথা বলবে। জীবন যা বলবে তারা সবাই তা মানবে। কোন উপায়

নেই। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কর্মচারী নেতা জীবনকে দোকানদারদের নেতা হিসাবে মেনে নিতে বাধ্য হয়। দুই পক্ষের তর্কবিতর্ক হয় বহু সময় ধরে। কর্মচারী নেতার দাবী বোনাস হিসাবে এক মাসের মাইনের টাকা কর্মচারীদের দিতেই হবে। কিন্তু দোকানদাররা বোনাস হিসাবে একটি পয়সাও দিতে রাজী নয়। দোকান-কর্মচারীরা বোনাস পাবার অধিকারী নয়। সে রকম কোন আইন নেই। তবে পূজো অনুদান বাবদ কর্মচারী পিছু কিছু টাকা করে দেওয়া যেতে পারে। জীবন দু পক্ষের কোন কথাতেই কোন মন্তব্য করছে না। চুপচাপ মাথা নীচু করে সবার সব কথা মন দিয়ে শুনে যাচ্ছে। পূজোয় বিভিন্ন ক্লাব আর বারোয়ারীকে কত টাকা চাঁদা দিতে হয়, এক কাপড়ের দোকানদার আর এক লোহার দোকানদার তার বিরাট হিসাব দাখিল করে। এক মনোহারীর দোকানদার তো বোনাস কথাটা শুনেই আগুন। এক বছর বেশী টাকা দিলে প্রতি বছরই সেই টাকা দিতে হবে। সুতরাং গত বছর যে টাকা দেওয়া হয়েছে এ বছরও তাই নিতে হবে। কর্মচারী নেতা তা মানতে রাজী নয়। গত বছরের থেকে এ বছর জিনিসের দাম অনেক বেড়েছে। প্রচণ্ড চেঁচামেচি। হৈ চৈ। মিটিং ভেঙে যাবার উপক্রম। কর্মচারী নেতা পূজোর সময় ধর্মঘটের হুমকি দেয়। দোকানদাররা তার মোকাবিলা করবে বলে শাসিয়ে দেয়। জীবন আর চুপ করে থাকতে পারে না। সবাইকে শান্ত হতে বলে। বক্তব্য রাখে।

—সভা শুরুর আগে আপনারা আমার মতামত বিবেচনা করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। অথচ আমার কোন কথা না শুনেই আপনারা সভা ভেঙে দেবার উপক্রম করছেন। আমার কিছু কথা আপনারা সবাই ভেবে দেখুন।

কর্মচারী নেতা জীবনের দিকে তাকিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে সিগারেটে টান মারছে। জীবন তার বক্তব্য বলে চলে। —পূজোতে আপনারা অনেকে অনেক টাকা চাঁদা দেন। সরকারের কাছে যে সব সাহেবরা যথেষ্ট মাইনা পান দোকানদাররা তাদের অনেককে অনেক কারণে

পূজো উপহার হিসাবে দামি দামি জিনিস পাঠান। মস্তানদেরও পূজোর সময় বাড়তি টাকা দিতে বাধ্য হন। কারণ বিপদের সময় পুলিশ ডাকলে পাওয়া যায় না। পেলেও কোন অজানা যাদুতে সত্যি মিথ্যে হয় আর মিথ্যে সত্যি হয়। এখন দেখা যাচ্ছে আপনাদের যত হিসাব, যত অভাব কর্মচারীদের জন্যে। দরিদ্র ঘরের যে সব মানুষ-গুলো বা ছেলেরা সকাল থেকে রাত অবধি আপনাদের দোকানে কাজ করে—খেলাধুলো, উৎসব-অনুষ্ঠান, আমোদ-প্রমোদ, সব কিছু পরিত্যাগ করে যারা দোকানের জন্যেই নিযুক্ত রয়েছে; সেই সব অসহায় দুর্বল মানুষগুলোকে এতটুকু কিছু দিতে আপনাদের যত কষ্ট। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা অন্যায় চাঁদার দাবী আর মেনে নেবেন না। বরং তাদের বলবেন যে আপনারা জীবন মুহুরীর কাছে টাকা জমা রেখেছেন, যার যা দাবী যেন তার কাছ থেকে নিয়ে নেয়। এ ব্যাপারে আপনাদের পুরোপুরি দায়িত্ব নিতে আমি রাজী আছি। আপনাদের মনে রাখা উচিত, কর্মচারীরা আপনাদের সন্তানের মত। সুতরাং পূজোয় যদি আপনাদের ছেলেমেয়েদের নতুন জামা কাপড় হয়, কর্মচারীদেরও একটা করে হওয়া উচিত। কর্মচারী নেতা মনে হয় জানেন না যে এ শহরে এমন অনেক দোকান আছে যেখানে কর্মচারী মাত্র ত্রিশ টাকা বেতন পান। স্বল্প বেতন ভোগী কর্মচারীর সংখ্যাই বেশী। দেড়শো-দুশো টাকা বেতনের কর্মচারীর সংখ্যা হাতে গুনে বলে দেওয়া যায়। যদি দোকানদাররা এক মাসের বেতনের টাকা বোনাস হিসাবে দিতে রাজীও হন, তবে ঐ টাকায় অধিকাংশ কর্মচারী একটা জামা প্যান্টও কিনতে পারবে না। তাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ যে খুচরো দোকানদাররা কর্মচারী পিছু পঞ্চাশ টাকা, আর পাইকারী-খুচরো দোকানদাররা একশো টাকা করে অনুদান মঞ্জুর করুন। অবশ্য যে সব দোকানদার তাঁদের কোন কোন কর্মচারীকে এর থেকে বেশী টাকা দিতে ইচ্ছুক তাঁরা তা দিতে পারেন। আমি জানি, এমন অনেক দোকানদার আছেন যাঁদের পক্ষে

পূজোর আগে কর্মচারীকে একশো টাকা দেওয়া কষ্টসাধ্য। কিন্তু নিজের সন্তানদের জন্যে আপনারা যেমন অনেক কষ্ট সহ্য করেন কর্মচারীর জন্যে বছরে একবার না হয় এটুকু কষ্ট করলেন!

দোকানদারদের মধ্যে শলাপরামর্শ শুরু হয়। দু একজন দোকানদার জীবনকে কর্মচারী ইউনিয়নের দালাল বলে গালাগালি করে। কিন্তু অধিকাংশ দোকানদারই আস্তে আস্তে জীবনের সঙ্গে একমত হতে থাকে। সত্যিই তো কর্মচারীরা আমাদের জন্যেই তো কাজ করে। হাতে দুটো পয়সা পেলে কত খুশী হবে। শুধু কি মশাই খুশী হবে, কত কাজ পাওয়া যাবে। ঠিক বলেছেন। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা চাঁদা দিয়ে আমাদের লাভ কি! ঠাকুর মণ্ডপে পূজো দেখতে গেলে কেউত চিনতে পারেই না, উল্টে বলে কালবাজারী, মুনাফাবাজ এসেছে। হ্যা হ্যা জীবনবাবুই ঠিক বলেছেন। আমরা জীবনবাবুর সঙ্গে একমত। সভা শেষ হল।

কর্মচারী ইউনিয়নের নেতা তখনো সিগারেট টানছে। উপস্থিত কর্মচারীদের দিকে তাকিয়ে চোখ টেপে। মুচকি হাসে।

—দেখলি কি রকম চালটা চাল্‌লাম। ধর্মঘটের নাম শুনে বুড়োটা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আমি তো জানি ও ব্যাটার অনেক দোকানে শেয়ার আছে। আমার সঙ্গে চালাকি নয়। চল্ সব অফিসে। অনেক চাঁদা বাকি।

ক'দিন পরে খুব ভোরে হন্তদন্ত হয়ে রমেন আসে জীবনের বাড়ীতে। সুবল কর্মকার পূজোর আগে পাঁচশো টাকা দাবী করে চিঠি দিয়েছে। জীবন এই কুখ্যাত লোকটির নাম শুনেছে বটে, কিন্তু বিশেষ চেনে না। রমেন চেনে। সুবলের চেয়ে অনেক বড় বড় মস্তান থাকলেও শয়তানীতে সে নাকি অদ্বিতীয়। বহু বড় বড় অফিসার নাকি ওর হাতের মুঠোয়। অফিসারদের টাকা যোগাড় করে দেওয়া, রাতবিরেতে সাহেবদেব নির্দেশ মত মদের ব্যবস্থা করা, পছন্দ মত মেয়ে মানুষ যোগাড় করে দেওয়া এসব কাজে সুবল ওস্তাদ। মস্তানদের ভয়ে জীবন কোনদিনই ভীত নয়। কিন্তু অফিসারদের ওপর হাত আছে শুনে জীবন ঘাবড়িয়ে যায়।

দুঃশ্চিন্তার সমান্তরাল রেখাগুলো জীবনের কপাল ছেয়ে ফেলে। কয়েক বছর আগে অফিসারদের সঙ্গে এক দোকানদারকে লড়াতে গিয়ে জীবন যে তার কি ক্ষতি করেছিল, তা সে কোন সময় ভুলতে পারে না।

দোকানদারটি ছিল পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের যুবক। পূজোর কিছু-দিন আগে সরকার পক্ষ কয়েকটা জিনিসের দাম নিয়ে স্থানীয় ব্যবসা-দারদের সঙ্গে আলোচনা করতে চায়। জেলা শাসক সভা ডেকেছেন। গত কয়েক বছর ধরে পূজোর আগে ঐ ব্যবস্থা চলে আসছিল। এতে স্থানীয় ব্যবসাদাররা মার খায়। জেলা শাসকের সভায় বক্তব্য রাখার জন্যে জীবন মাথা খাটিয়ে দোকানদারটিকে কিছু কথা শিখিয়ে দেয়। জীবনের এই শিক্ষাই দোকানদারটিকে ছন্নছাড়া করে দেয়। বিনা পারিশ্রমিকে জীবন দোকানদারটির পাকা খাতা তৈরী করে দিয়েছিল। তাই সে জীবনকে শ্রদ্ধা করত।

চৈত্র মাসে যে সরষের তেলের দাম ছিল পাঁচ টাকা কেজি, এখন তার দাম হয়েছে এগারো টাকা। পূজোর আগে গরীব মানুষদের মুখের দিকে তাকিয়ে জেলা শাসক সরকারী নির্দেশ মত সরষের তেলের দাম বাঁধতে চান সাড়ে ন' টাকা কেজি। যে চিনির দাম ছিল সাড়ে তিন টাকা কেজি, এখন তার দাম হয়েছে সাড়ে সাত টাকা। জেলা শাসক চিনির দাম বাঁধতে চান ছ' টাকা কেজি। কোন্ কোন্ জিনিসের দাম কত টাকায় বাঁধা হ'ল, জেলা শাসক সে নির্দেশ পড়ে শুনিয়ে দেন। কোন কোন দোকানদার হাত জোড় করে বাঁধা দরগুলো আরও কিছু বাড়িয়ে দেবার অনুরোধ করে। নতুবা তাদের অনেক টাকা ক্ষতি হয়ে যাবে। জেলা শাসক রাজী হলেও, অন্যান্য অফিসাররা আর এক পয়সাও বাড়তে রাজী হয় না। সুতরাং সবাই চুপচাপ। কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করে জলে বাস করার সাহস নেই কারুর। এই সময় জীবনের শেখান দোকানদারটি তার বক্তব্য রাখতে ওঠে।

—চৈত্র মাসে যে সরষের তেলের দাম ছিল পাঁচ টাকা কেজি, অর্থনীতির হিসাব অনুযায়ী এখন তার দাম হওয়া উচিত বড়জোড় ছ' টাকা।

চিনির দাম চার টাকার বেশী হওয়া উচিত নয়। সুতরাং সরকার যদি গরীব মানুষদের দিকে তাকিয়ে জিনিসপত্রের দাম বাঁধতে চান, তবে সেটা চৈত্র মাসে ফসল ওঠার সময় বাঁধুন, নতুবা প্রতি বছর পূজোর আগে বাঁধলে অর্থনীতির হিসাব অনুযায়ী বাঁধুন। আজগুবি দরগুলো আসছে কোথা থেকে! আপনাদের বাঁধাদরে মাল বেচে আমরা মফঃস্বল ব্যবসায়ীরা বছর বছর লোকসান খাচ্ছি। কিন্তু কোটিপতি ব্যবসায়ীদের এতে কোন ক্ষতি হয় না। বরং কোটি কোটি টাকা লাভ হয়। চৈত্র মাসে তাঁরা কোটি কোটি টাকার মাল মজুত করে রাখেন। সরকারী বাঁধা দরে বেচাকেনা করতে তাঁদের কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না। দর যদি বাঁধতেই হয় অর্থনীতির হিসাব মত বাঁধুন। চিনির দর চার টাকায় বাঁধুন। সরষের তেলের দর ছ' টাকায় বাঁধুন। এতে আমরা আরও বেশী লোকসান খাব বটে, কিন্তু কোটিপতিরাও অতি মুনাফা করতে পারবেন না। তারপর সরকারকে বাঁধাদরে জিনিসপত্র যোগাড় করে দেবার দায়িত্ব নিতে হবে। নতুবা সরকারের কোন বাঁধা দরই আমরা মানতে পারব না।

উপস্থিত স্থানীয় সাংবাদিকরা জেলা শাসক আর অফিসারদের লক্ষ্য করে নানা প্রশ্ন ছুড়তে থাকেন। সভায় দারুণ গণ্ডগোল শুরু হয়। জেলা শাসক সভা ছেড়ে চলে যান। সভা ভেঙে যায়।

দু' এক মাস যেতে না যেতে এই দোকানদারটির ওপর যে কি অত্যাচার শুরু হয়েছিল জীবন তা ভুলতে পারে না! কেসের পর কেস। ঝামেলার পর ঝামেলা। বাধ্য হয়ে ছেলেটি দোকান বন্ধ করে দেয়। কিন্তু তাতেও রেহাই পায় না। ছেলেটির বিয়ে। বিয়ের দিন সকালে কতকগুলো মিথ্যে অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ছেলেটিকে গ্রেপ্তার করে। খবর পেয়ে জীবন পাগলের মত ছুটে যায় শহরের নামকরা উকিলের বাড়ী। শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ধরাধরি করে। পুলিশ অফিসারদের হাতে পায়ে ধরে। বহু কষ্টে জীবন ছেলেটির জামিন করিয়ে লগ্ন পেরিয়ে যাবার কিছু আগে পাত্র নিয়ে

পাত্রী-বাড়ী পৌঁছায়। সেই থেকে জীবন অফিসার জাতটাকে হাড়ে হাড়ে চেনে।

সুবল কর্মকারের চিঠিটাকে জীবন পাত্তাই দিত না, যদি না তার পেছনে অফিসাররা থাকতেন। কিন্তু এখন কয়েক বছরের আগের অবস্থা নেই। হাওয়া বদ্‌লেছে। হাওয়াটা উত্তরে না দক্ষিনা জীবন কাজের দিক দর্শন যন্ত্রে তা যাচাই করতে চায়। দৃঢ়ভাবে সে রমেনকে বলে—সুবল কর্মকারকে একটি পয়সাও দেবে না। দেখা যাক কি করে!

আট

বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গা পূজোর আর ক'দিন মাত্র বাকি। রামলালকে কিছু টাকা জমা দিয়ে আসতে জীবন রমেনকে নির্দেশ দেয়। রমেন পূজোর আগে কলকাতায় যেতে রাজী নয়।

—কাকু, পূজোর পর রামলালদাকে টাকা দিয়ে আসব।

—অনেক দিন হয়ে গেল মাল পাঠিয়েছে, কিছু দিয়ে আসা উচিত। কিছু বল্‌লে শুনে আসা উচিত।

নিছক টাকা দিয়ে আসার জন্যেই জীবন রমেনকে কলকাতায় পাঠাতে চায় এমন নয়। এর পেছনে জীবনের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু সে কথা রমেনকে বলা যায় না।

—টাকার দরকার হলে রামলালদা নিজেই চলে আসবে। এই তো গত মাসে এসে টাকা নিয়ে গেল।

রামলাল গত মাসে কেন যে এসেছিল এখন জীবনের কাছে সেটা আর রহস্যাবৃত নয়। রামলাল আর কখনো এখানে আসবে কিনা সে ব্যাপারেও জীবনের সন্দেহ আছে। রমেনের দোকান দেখা রামলালের একটা অছিলা ছিল মাত্র। এই জন্যেই ভাইপোকে সঙ্গে নিয়ে ছুটির দিন

দেখে রামলাল এসেছিল! কমলার সঙ্গে দেখা করার প্রস্তাবটা ভাইপোই তোলে। জীবনকে সঙ্গে নিয়ে রামলালকে কমলার ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিয়ে ভাইপো আবার জীবনকে গাড়ি করে রমেনের দোকানে পৌঁছে দেয়। জীবন কিছুই ভোলেনি। স্কুল থেকে ছুটি নিয়েছে শুনে ক'দিন আগে জীবন কমলার বাসায় এসেছিল। মেয়েকে দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল! রামলাল ঘুরে যাবার পর রাতারাতি কমলার চেহারাটাই পাল্টে গেছে। অত বড় বড় চোখ দুটো গর্তে বসে গেছে। দু চোখের কোলে কালি পড়েছে। চাঁদকে যেন রাহুতে ধরেছে। এ হেন শক্ত মেয়ে কমলার হ'ল কি! রামলাল কি বলেছে কমলাকে! কিছু করতে চেষ্টা করেনি তো! জীবন শর্মা আবার ভুল করেছে নাকি! সেদিন ভাইপোর কথায় ঐভাবে খরগোসের খাঁচায় চিতা বাঘটাকে পুরে দিয়ে আসা জীবনের কোন মতেই উচিত হয়নি। এ ব্যাপারে কোন কথা মেয়েকে জিজ্ঞেস করাও যায় না।

কমলার মুখে কথা নেই। চোখেও জল নেই। কিন্তু গোটা মুখখানা শ্রাবণের মেঘের মত থম্‌থমে, বিষণ্ণ, ব্যথাতুর। প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণায় মেয়েটা ছিন্নভিন্ন। জীবনের বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হয়নি।

—কি হয়েছে তোর?

—কিছু না।

মা মরা স্বামী হারা মেয়ের মুখের দিকে জীবন তাকাতে পারে না। জোর করে মুখে হাসি টানে।

—জানিস, উৎপল চিঠি দিয়েছে। ও সরকারী চাকরী ছেড়ে এখানে চলে আসছে।

কমলার মুখে কথা নেই। কোন কৌতূহলেরও প্রকাশ নেই। উদয় মারা যাবার পরের দিনও জীবন মেয়ের এমন অবস্থা দেখেনি। বন্ধুর ছেলের ব্যবসার দিকে তাকিয়ে বাপ মেয়েকে অসৎ পথে ঠেলে দিতে চেয়েছে! ছি ছি। কি করতে কি হ'ল! মেয়ের কাছেও জীবন আজ অপ্রস্তুত। মুখে দেঁতো হাসি টানে।

—উৎপল কাছাকাছি গাঁয়ের স্কুলে মাষ্টারী নিয়ে এখানে চলে আসছে। বৌমা, খোকা, খুকুমণি বাড়ীটা আমাদের আবার ভ'রে যাবে।

তবু কমলার মুখে কথা নেই। না, কমলা কথা বল্‌বে না। জীবন মাথা নীচু করে থাকে। কমলা মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এভাবে কোথাও থাকা যায় না। জীবন সিঁড়ির দিকে পা বাড়ায়। পেছনে দরজা বন্ধের বিকট শব্দটা জীবন শুন্‌তে পায়।

কমলা রামলালের কোন কথাই ভুলতে পারছে না। কমলাকে দেখে একমুখ হেসে কিছুমাত্র ভনিতা না করে রামলাল বলেছিল--তোমার সর্বনাশের সব কথা জ্যাঠাবাবুর কাছে শুনেছি। ইচ্ছে হয়েছিল সেদিনই আসি। কিন্তু ভেবে দেখলাম এহুরোদ্দিনবাবু মানে তোমার উদয়দা মাত্র কিছুদিন আগে মারা গেছেন। তখন এলে তোমার বেদনাহত অবস্থা দেখতে হ'ত। সেই ভয়ে কিছুদিন দেরী করে এলাম।

রামলালকে দেখেই কমলা চমকে ওঠে। পর্দার পাশে দাঁড়িয়ে দুহাতের তালু দিয়ে বার বার মুখ মোছে। মুখ ঢাকার চেষ্টা করে। কোথাও ছুটে পালাতে পারলে বাঁচে। রামলালের সে সব দিকে খেয়াল নেই। কমলার পোশাকের আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে বটে, কিন্তু চেহারাটি প্রায় আগের মতই আছে। সেই বড় বড় চোখ। সেই পাগল করা মুচকি হাসি। সেই দুই গালের ওপর টোল। কোঁকড়া কোঁকড়া এক মাথা চুল। সব ঠিক আগের মতই।

—বাপীর কাছে আপনার অনেক কথাই শুনেছি। বাঙ্‌লায় এম, এ, পাশ করেছেন। চেহারাটাকেও একদম প্রথম শ্রেণীর দার্শনিকের মত করে ফেলেছেন।

মিষ্টি স্বরে কমলা বলে।

কমলার মুখে প্রশংসা, রামলালের আনন্দ আর ধরে না।

—সত্যি, তোমার মত মেয়ের সঙ্গে আমি বোকার মত এমন সব কথা বলতাম! আজ সে সব কথা মনে পড়লে নিজেরই লজ্জা করে।

কমলা ব্যস্ততা দেখায়।

—আপনি বসুন। আপনার জন্যে চা খাবার করে আনি।

কমলা দ্রুত চলে যায়। পালিয়ে বাঁচে।

রামলাল কমলার নিজের হাতে সাজানো গোছান ঘরটার চারিদিক দেখতে থাকে। কি সুন্দর সাজিয়েছে ঘরটাকে, যেন আঁকা ছবি। মেঝেটা সাদা সিমেণ্টের। কিন্তু মোছার গুণে হয়েছে শ্বেত পাথরের মত। আল্‌নাটায় সাদা থান, সাদা সায়া, সাদা ব্লাউজ। রঙের কোন চিহ্ন নেই। বিরাট ঐ ফটোটা কার! ঠাকুরের মত সাজান! ঐটাই মনে হয় এহুরোদ্দিনবাবুর ফটো। দুই ধারে দু'ঝাড় ধূপ জ্বলছে। রজনীগন্ধার মালাটা মনে হয় আজই পড়িয়েছে। ফুলগুলো টাট্‌কা! রোজই এভাবে সাজায় নাকি! মনে হয় রোজই সাজায়। নতুবা এত গুছানো এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকত না।

এক হাতে থালা ভর্তি লুচি, মিষ্টি, তরকারী, অন্য হাতে চায়ের কাপ নিয়ে কমলা রামলালের সামনে নাবালিকার মত থম্‌কে দাঁড়ায়। ছোট টেবিলটার ওপর টুকিটাকি জিনিস রয়েছে। আগেই কমলার ওটাকে পরিষ্কার করে রাখা উচিত ছিল। কমলার বড় বড় চোখ দুটোর অসহায় চাউনিগুলো রামলালের ভারি ভাল লাগছে। সাক্ষাত অন্নপূর্ণা। থাক্ থাক্ অমন করে আরও একটু দাঁড়িয়ে থাক। প্রিয়তমাকে দেখে দেখে রামলালের মন ভরতে চায় না। তাড়াতাড়িতে বুকের কাপড়টা কখন যে সরে গেছে কমলা তা জানে না। ডানদিকের স্তনটা উঁচু হয়ে ঠিকরে রয়েছে। মাঝখান দিয়ে কাটা মোচা। ঐতো বোঁটাটা! পাতলা ব্লাউজের নীচে নিজের অক্ষত, নিটোল, সতেজ অস্তিত্বটা কি সুন্দর জানিয়ে দিচ্ছে। রামলাল কমলার বুকের দিকেও তাকাচ্ছে। কমলা এখন কি যে করে! দুটো হাতই জোড়া। রামলাল উঠে গিয়ে টেবিলটা খালি করে। হাসে। দুষ্টু হাসি।

—তোমার কাজের মেয়েটাকে দিয়ে পাঠালেই পারতে!

—সেকি কথা! তা'কি হয়!

কুঁজো থেকে জল ঢাল্‌তে ঢাল্‌তে কমলা আদুরে গলায় কথা বলে।

—সবটুকু খেয়ে নিতে হবে কিন্তু!

—তুমি বল্‌লেও খাব, না বল্‌লেও খাব। এর এতটুকু আমি ফেল্‌ব না। ফেল্‌তে পারব না।

সঙ্গে সঙ্গে কুঁজোর মুখটা একটু ওপরের দিকে উঠে যায়। বন্ধ হয় জল ঢালার বক বক শব্দটা। লজ্জা রাঙা মুখে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে কমলা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

—কৈ, জল দাও।

—ও হ্যা; দিচ্ছি।

এক টুকরো লুচি রামলাল মুখে দিতে যাবে ফুস করে ফ্যানটা বন্ধ হয়ে গেল। কমলা হাত পাখা আনে। রামলালকে বাতাস করে।

ব্যস্ত হয়ে রামলাল বলে—বাতাস করতে হবে না।

—না; গরম লাগবে।

—কাজের মেয়েটাকে ডাকো। ও বাতাস করুক।

—না না, তা'কি হয়!

—তোমার কষ্ট হবে। হাত ব্যথা করবে। পাখাটা আমাকে দাও।

—না। আপনি খান।

কমলা এখন অনেকটা সহজ হয়েছে। রামলালও বেশী কথা বলার সাহস পাচ্ছে। রামলাল এক চুমুক জলে গলাটা ভিজিয়ে নেয়।

—কমলা; আজকাল তোমার বয়সি অনেক মেয়ের বিয়েই হয় না। এমন কি বয়স তোমার! এসব পোষাক পড়ে থাক কেন?

ভাগ্যি হাতে পাখাটা ছিল। কমলা মুখ ঢাকে।

—সে কি কথা রামলালদা! আমি যে বিধবা।

—ওসব কুসংস্কার। আজকাল বুড়ি বিধবারাও ওসব মানে না।

—কিন্তু আমি যে মানি। আমার যে মানতে ভাল লাগে।

রামলাল মাথা নীচু করে। দাঁতের পাটির নড়াচড়া বন্ধ। লুচিগুলো আঙুল দিয়ে টিপছে। মাথা তুলে কমলার মুখের দিকে তাকায়। আবার মুখ নামিয়ে নেয়। রামলাল কিছু বল্‌তে চায়। বল্‌তে পারছে না। কমলা বুঝতে পারে।

—আর দুখানা লুচি দেব ?

রামলাল চমকে ওঠে। ডান হাতটা কেঁপে যায়। লুচির টুকরোটা মাটিতে পড়ে।

—না না সে কথা নয়। একটা কথা বলব ?

চায়ের কাপ থেকে এখনো ধোঁয়া উঠছে। বাষ্প রেখাগুলো ফণা তোলা সাপ। গা শির শির।

—নিশ্চয়ই বলবেন।

—তুমি আমার ঘরে আসবে ? আমি'ত তোমার জন্যেই অপেক্ষা করে আছি এতদিন ধরে ! তুমি এলে আমার জীবনটা পূর্ণ হয়। তুমি যে ভাবে বল্‌বে সে ভাবেই বিয়ের ব্যবস্থা হবে।

এ ধরনের কথার জন্যে কমলা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। যাহোক একটা শব্দ করে কমলা রেহাই নেবার চেষ্টা করে।

—সে কি কথা রামলালদা। এই ঘরটাই আমার স্বর্গ। এই ঘরের মধ্যেই আমি শান্তি পাই। আমি যে বিধবা। মুসলমান।

—এ সব কুসংস্কার কমলা। যে মাটিতে বিদ্যাসাগর জন্মেছেন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল জন্মেছেন, আমরা সেই মাটিরই উত্তর পুরুষ। আমাদের এসব চিন্তা করাও পাপ।

—আপনি জ্ঞানী ব্যক্তি। হয়ত আপনার কথাই ঠিক। কিন্তু আপনাদের রক্ষণশীল সমাজ এসব মেনে নেবে না। আপনার দৈনন্দিন জীবনটা সামাজিক যন্ত্রণায় ছিন্নভিন্ন হবে। আপনি আপনার সমাজের কোন মেয়েকে বিয়ে করে সুখী হ'ন।

কমলার হাতের পাখা বন্ধ হয়ে গেছে। গলার স্বরও প্রায় বুঁজে

এসেছে। চোখের জল বেরিয়ে আসতে চাইছে ইচ্ছা শক্তির সব বাঁধ চুরমার করে।

রামলালের মুখে ম্লান হাসি। কান্নার চেয়ে কষ্টদায়ক।

—অন্য মেয়েকে বিয়ে করে এ জীবনে সুখী হওয়া যদি সম্ভব হ'ত অনেক দিন আগেই তা করতে পারতাম কমলা। তা আর সম্ভব নয়। বিয়ের কথা যখনি চিন্তা করেছি, আমার সামনে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে খুঁজে পাইনি। এখন একমাত্র তুমিই পার আমাকে সুখী করতে।

নিজের সঙ্গে নিজের লড়াই। সব থেকে কঠিন লড়াই। মানুষকে জীবন্মৃত করে। কমলা অনেকক্ষণ নিজের সঙ্গে লড়েছে। আর পারছে না।

—আমি পরে আপনাকে জানাব।

নীচে গাড়িতে হর্ণের শব্দ। ভাইপো এসে গেছে। রামলাল উঠে দাঁড়ায়।

—আমি তবে যাই ?

—আচ্ছা।

কমলা টল্‌ছে। কাঁপছে। গাড়ির দরজা বন্ধের শব্দের অনেক আগে কমলার ঘরের দরজা বন্ধের শব্দ শোনা যায়। বুকফাটা কান্নায় কমলা আছড়ে পড়ে উদয়ের ফটোর সামনে।

—রামলালের এ হেন গভীর ভালবাসাকে আমি দাম্ভিকের মত অপমান করেছি। পশুর মত হত্যা করেছি। সেই মহাপাপেই ভগবান তোমার মত মানুষের ভালবাসা থেকে আমাকে বঞ্চিত করলেন। আমি মহাপাপী। তুমি যেখানেই থাক আমাকে আশীর্বাদ কর। সাহায্য কর। আমাকে যেন তোমার কাছ থেকে কেউ সরিয়ে নিতে না পারে।

রামলালের অসহায় মুখখানা কমলা ভুলতে পারে না। মনটা তার কামারশালের তাতান লোহা। উদয়ের গভীর প্রেমের সহস্র স্মৃতি আর রামলালের অসহায়, অপমানিত, অত্যাচারিত অস্তিত্ব সহস্র বিষ-তীরের মত কমলাকে বিদ্ধ করতে থাকে প্রতিটা মুহূর্ত।

নয়

জীবন শত চেষ্টা করে, বহু রকমের বুদ্ধি খাটিয়েও রমেনের দোকানের বেচাকেনার উন্নতি করতে পারছে না। সারা জীবন ধরে ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বহু অভিজ্ঞ জীবন অল্পবয়সী ছেলেগুলোর সঙ্গেও গো-হারান হেরে যাচ্ছে।

সাইকেলের ওপর বসে পা'টাকে দোকানের সিঁড়িতে লাগিয়ে খরিদ্দার জিজ্ঞেস করে—বাবু, লবণ বস্তা কি দর?

—উনত্রিশ টাকায় দেব।

জীবন সাগ্রহে বলে।

সঙ্গে সঙ্গে পায়ের চাপে সাইকেলটাকে এগিয়ে নিয়ে জুতোর সোলটা জীবনের দিকে করে খরিদ্দার বলে—সাতাশ টাকায় কত বস্তা নেবেন?

জীবন চিন্তিত। তাইতো। অতটা হাঁটাহাঁটি। অতগুলো আড়ত ঘোরাঘুরি। বহু পরিচিত অতগুলো দালালের সঙ্গে আলোচনা করে জীবন প্রায় দেড় মাস আগে ক্যাশ টাকা দিয়ে ছাব্বিশ টাকা দরে একশো বস্তা লবণ কিনেছিল। আজ পর্যন্ত মাত্র পাঁচ বস্তা বিক্রি হয়েছে। তাও খুচরো। পাইকারী এক বস্তাও নয়। ব্যাপার কি! আনার খরচ ধরে বস্তায় পঞ্চাশ পয়সা লাভ না করলে চলে কি করে!

—যেদিন কিনলাম পরের দিনই লবণের দাম কেটে গেল নাকি!

জীবন নিজেকে নিজে বলে।

রমেন ব্যস্ত হয়।

—না না কাকু, কলকাতায় লবণের দর উঁচু। হোলসেল কনজুমার্স সরকারের কাছ থেকে সস্তা দরে লবণ, সোডা, কাপড়ের কোটা পায়। অল্প কিছু সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রি করে বাকিটা ওরা কলকাতার

দরে খোলা বাজারে বেচে দেয়। আনার খরচায় আমরা মার খাচ্ছি। আপনিতো মেমো চালান ছাড়া কোন মাল কিনতে দেবেন না!

তাইতো, সোডার বিক্রিও নেই বল্‌লেই চলে! জীবন চিন্তা করে।

—বাবু, এক টিন রেপসীড রিফাইন কি দরে দেবেন?

—একশো ষাট টাকা।

কিন্তু খরিদ্দার হাঁটা দেয়। পায়ে যেন ইঞ্জিন ফিট করা।

—এ শালার দোকানে সব জিনিসেরই দাম আকাশ ছোঁয়া।

গত পনেরো দিনে জীবন এক টিনও রেপসীড রিফাইন বেচতে পারেনি।

—কি ব্যাপার! রামলাল এখান থেকে ঘুরে যাবার পর মালপত্রের দাম বেশী ফেল্‌ছে নাকি।

—না না কাকু, রামলালদা রেপসীড তেলের যে দাম ফেলেছে, এ দরে কলকাতার কোথাও পাওয়া যাবে না। একদম আমদানির দর ফেলেছে। নতুন দোকান বলে রামলালদা দোকানটাকে দাঁড় করানোর খুবই চেষ্টা করছে। দেখেন না, জিনিস পত্র ভাল বলে আমাদের দোকানে খুচরো বিক্রি কত বেশী!

—কিন্তু পাইকারদের যাকে যে দর বলছি সেইতো ফিরে যাচ্ছে!

—রেশনের তেল কাকু। রেশনে রেপসীড তেল দিয়েছে। খোলা বাজারে টিন টিন আসছে। ক্যাশ টাকা দিলে কলকাতার থেকে ছ' সাত টাকা কমে দিয়ে যায়। কিন্তু আপনি যে পাকা মেমো ছাড়া কোন মাল কিনতে মানা করেছেন!

রমেনের মুখে হতাশার ভাব।

—রেপসীড তেল না হয় রেশনে দিয়েছে। সরষের তেল, ডাল-ডুলেরই বা বিক্রি কৈ? যাকে যে দর বলছি সেইত চোখ রাঙাচ্ছে!

—রাঙাবেই তো। জেলা হাসপাতালের, পুলিশ রেশনের সরষের তেল, ডাল কলকাতার থেকে অনেক কম দামে প্রচুর পাওয়া যায়। ওস্তাদকে আগে থেকে টাকা দিয়ে রাখলে প্রতি মঙ্গলবারে মাল দিয়ে যায়। মাল

ধরব কাকু ? ভাল লাভ হবে। কয়েকটা মাল সুবিধা দরে পেলে বাকি মালও খরিদ্দার আমাদের ঘর থেকে নেবে। বেচাকেনা অনেক বেড়ে যাবে। সারাদিন বসে থাক্‌তে আর ভাল লাগে না।

—না। আমি মরি তারপর ওসব ব্যবসা কোরো। এনফোর্সমেণ্ট এলে হিসাব দেখাবে কি করে ?

জীবন মুখটা কঠিন করে।

—এনফোর্সমেণ্টের সঙ্গে লাইন করা যায় কাকু! বলেন তো আমি লাইন করতে পারি!

—না। দরকার নেই।

উৎপলের মেয়েটা দারুণ দুষ্টু। দেখতে হয়েছে ঠিক রমলার মত। মালপত্র নিয়ে ট্রেন থেকে নামতে উৎপলের অসুবিধা হতে পারে। জীবন তাই ষ্টেশনে এসেছে। শ্রেষ্ঠাকে দেখে জীবন অবাক। মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসতেই শ্রেষ্ঠা মায়ের কোল ছেড়ে হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে চলে আসে দাদুর কোলে। জীবন উৎপলের দিকে তাকায়।

—এ যে দেখছি তোর মা ঘুরে এসেছেরে ?

উৎপলের স্ত্রী হাসে।

—দেখেই মনে হয় চিনতে পেরেছে। দিব্যি আপনার কোলে চলে গেল। অথচ অপরিচিত কারুর কোলে যেতে চায় না।

শ্রেষ্ঠার এখন দাদু অন্ত প্রাণ। দাদুর সঙ্গে খেলবে বলে রাত অবধি জেগে থাকে। শ্রেষ্ঠার বায়না সামলাতে সকালের দিকে রমেনের দোকানে যেতে জীবনের আজকাল প্রায়ই দেরী হয়ে যায়। সে দিন ছিল ইংরাজী মাসের দু তারিখ। জীবনের শরীরটা ভাল ছিল না। শ্রেষ্ঠাও দারুণ বায়না ধরেছিল। দোকানে পৌঁছতে জীবনের বেলা নটা বেজে যায়। দূর থেকে জীবন দেখে রমেনের দোকানের সামনে বেশ ভীড়। একটা জীপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্যাণ্ট শার্ট পড়া পোর্টফোলিও ব্যাগ হাতে কয়েক-

জন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ভেতরেও রয়েছেন কয়েকজন। জীবন দোকানে ঢুকতেই রমেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

—কাকু, এনারা এনফোর্সমেন্ট অফিসার। দোকান সার্চ করতে চাইছেন। খাতাপত্র দেখতে চাইছেন।

—খাতা পত্র দেখাও। গোডাউনে নিয়ে যাও।

সহজভাবে জীবন বলে।

সকালের দিকে একটা অচেনা খরিদ্দারকে পঁচাত্তর কেজি ওজন লিখে রমেন এক বস্তা লবণ বেচেছিল। মেমো বই দেখে সাহেবরা তাই প্রথমেই লবণের গোডাউনে গেলেন। খাতা অনুযায়ী বস্তার হিসাব ঠিকই আছে। কিন্তু ওজন! প্রতিটা বস্তা পুরো পঁচাত্তর কেজি হবেতো! সাহেবদের সন্দেহ হয়। কয়েকখানা বস্তা ওজন করতে বলেন। লবণের বস্তা ওজন হ'ল। আটসট্টি থেকে একাত্তর কেজি। এক বস্তাও পঁচাত্তর কেজি নয়।

—এত দেখছি ডাকাতি স্যার!

ছোট সাহেব বড়কে বলেন।

—ডাকাতি নয়, এসব চিটিং। চারশো বিশ। সমাজের শত্রু।

ডান হাতের ছোট লাঠিটা বাঁ হাতের তেলোতে ঠুকতে ঠুকতে সাহেব সমস্ত লবণ সিজ করার নির্দেশ দেন।

এবার সরষের তেলের পালা। প্রতি টিনে সরষের তেল থাকে নীট ষোল কেজি। টিন সমেত সতেরো কেজি। না না সতেরো কেজি একশো। য়ুঁহু, সতেরো কেজি দেড়শো। না না পুরো সতেরো কেজি দুশো। কত গুণ ভাগ, কত অঙ্ক। সব সরষের তেল ওজন হ'ল। মজুত খাতায় লেখা ওজন থেকে তের কেজি তেল কম। সুতরাং সমস্ত সরষের তেল সিজ হ'ল। জীবন প্রতিবাদ করে।

—সারাদিন খুচরো পাইকারী বিক্রি হচ্ছে। এত নিখুঁত হিসাব রাখা যায়? দোকানদারীটা তো অঙ্ক শাস্তর নয়।

বড় সাহেব বাঁ চোখটাকে ছোট করেন। সিগারেটে টান দেন। মুখটাকে বিকৃত করেন।

—এসব কথা কোর্টে গিয়ে বলবেন। আমাদের কাছে শুধু কথা বলে কোন লাভ হবে না।

খাতার সঙ্গে প্রায় সব মজুত মালে গরমিল। সুতরাং প্রায় সব মাল সিজ হয়ে যায়। আইনের যেসব ধারার ফাঁদে রমেন পড়ে তাতে সাহেবরা রমেনকে গ্রেপ্তার করে গারদে পুরতে পারতেন। কিন্তু অল্প বয়স বলে কড়া ধমক দিয়ে এ যাত্রা দোকানেই জামিন দিয়ে গেলেন। সাহেবরা আইন অনুযায়ী খাতাপত্র ঠিক রাখতে বলেন। আসলে খাতাপত্রের ব্যাপারে দোষটাতো রমেনের নয়। দোষটা জীবন মুহুরীর। সাহেবরা যে-কোনদিন আবার আসতে পারেন; যাবার আগে সে কথা রমেনকে জানিয়ে দিয়ে যান।

—সুবল কর্মকারকে না চটানোই উচিত ছিল কাকু! টাকাটা দিয়ে দিলেই হ'ত।

বিরক্তির সুরে রমেন বলে।

জীবন মাথায় হাত রাখে।

—অপরকে ভয় করে শান্তিতে বাঁচা যায় না রমেন! কতজনের কত অন্যায় দাবী মেটানোর ক্ষমতা আছে তোমার?

দামী পোশাক পরা স্বাস্থ্যবান এক যুবক লাফিয়ে রমেনের দোকানে ঢোকে। মুখে বিদ্রূপের হাসি।

—কিরে রোমু, ব্যবসা করে কেমন উন্নতি করছিস? খুব তো আমায় জ্ঞান দিতিস, ওসব লাইন ছেড়ে ব্যবসা করতে। শান্তি পেতে। তা হ্যাবে, তুই শান্তি পাচ্ছিস তো? বোক্‌কা……

জীবন ছেলেটাকে চেনে না। কোন দিন দেখেছে বলেও মনে পড়ে না। রমেন চেনে। ছোট বেলায় গাঁয়ের স্কুলে ওরা একসঙ্গে পড়ত। ক্লাসের মাইনের টাকা কয়েক মাস বাকি পড়ায় হেড মাষ্টার মশাই ওর নাম কেটে দিয়েছিলেন। এখন অবশ্য ওদের অবস্থা ভাল হয়ে গেছে।

ওর দাদাটা বেশ ভাল ছেলে। এখন খুব বড় কনট্রাক্টর। ঐ ছেলেটাই এ রকম অসভ্য। কয়েকটা ট্রেন ডাকাতি আর ব্যাঙ্ক ডাকাতির সন্দেহে পুলিশ ওকে বেশ কয়েকবার গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে পুলিশ নাকি ওকে বার বার ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে।

অমলবাবুর কথা জীবনের আজ বার বার মনে পড়ছে। অমলবাবু বহুদিন আগে জীবনের বিড়ি-ঘরের খরিদ্দার ছিলেন। অমলবাবুর সঙ্গে জীবনের সম্বন্ধটা নিছক ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সততা, ভদ্রতা জাতীয় নানা গুণ দিয়ে জীবন অমলবাবুর পরিবারে একটা বিশেষ মর্যাদার আসন দখল করেছিল। অমলবাবুর বাড়ীতে ক্রিয়াকর্মে জীবনের বাড়ীর সবাই আমন্ত্রিত হ'ত, নিকট আত্মীয়ের মত। তারপর জীবনের জীবনে কত ঘটনা। অমলবাবুও চলে গেলেন এ পৃথিবী ছেড়ে। কিন্তু অমলবাবুর বাড়ীতে জীবনের মর্যাদা এতটুকু নষ্ট হয়নি। অমলের ছেলে বিমল। রাজনীতি করে। নির্বাচনে দাঁড়িয়ে এ পাড়ায় প্রচারে এসে বিমল প্রথম দেখা করে তার জীবন কাকুর সঙ্গে। জীবনকে কেউ জীবন মুহুরী বল্‌লে বিমল তীব্র আপত্তি করে। মুহুরীর কাজটা ওনার একটা শখ। আসলে ভদ্রলোক একটা জাত ব্যবসায়ী। বিমল এখন মন্ত্রী হয়েছে। ক্যাবিনেট মিনিষ্টার। রমেনের দোকানে এনফোর্সমেন্ট পুলিশের ঝামেলা, জীবনের মতে আইনের ওপর বলাৎকার মাত্র। এর পরিণতি দেশের পক্ষে গুরুতর হ'তে বাধ্য। কিছু একটা করতেই হবে। জীবন আসে কলকাতায়। বিমলের সঙ্গে দেখা করতে।

বিমল কলকাতায় নেই। কোথায় কি উদ্বোধন করতে বাইরে গেছে। ফিরতে কয়েকদিন দেরী হবে। খবর নিয়ে জীবন জানতে পারে। তাই কলকাতাতে অপেক্ষায় থাকে। বিমলের সঙ্গে দেখা না করে সে ফিরবে না। নির্দিষ্ট দিনে জীবন বিমলের সঙ্গে দেখা করে।

সত্য অভিজ্ঞতার সব কথা বুঝিয়ে বলে। বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রচুর সময় দিয়ে বিমল জীবনের সব কথা শোনে। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

—কাকাবাবু, আমাদের হাতে সীমিত ক্ষমতা। গোটা সমাজ ব্যবস্থাটা ঢেলে সাজতে না পারলে এসব অত্যাচার অনাচারের কোন প্রতিকার করা যাবে কি? তবে আপনাদের কেসটার ব্যাপারে খোঁজ খবর নেব।

—আমি নিছক আমার কথাই তোমাকে জানাতে আসিনি বাবা! দেশের হাজার হাজার ছোট দোকানদার সাতটা থেকে রাত দশটা অবধি পরিশ্রম করে। এরাও এক ধরণের শ্রমিক। দেশের নানা অবাস্তব আইন, সমাজ ব্যবস্থা আর রেশন বাজার খোলা বাজারের যাঁতাকলে এরা অসৎ পথে যেতে বাধ্য হয়। অপরকে অসৎ হতে সাহায্য করে। এদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অনেকেই এদের নিয়ে খেলে। কিন্তু এরাও জীবনে শান্তি চায়। কাজকারবারের সামাজিক স্বীকৃতি চায়। আত্মসম্মান নিয়ে সমাজের আর পাঁচজনের মত বাঁচতে চায়।

—কি করা যায় বলুন তো কাকাবাবু? আপনার উপদেশ কি?

বিমল হাতের কলমটা কলমদানিতে গুঁজে দেয়।

—কি করতে হবে আর কি হবে না, আমি তা জানি না। তবে দেশ, সমাজকে সর্বনাশ ও অধঃপাতের হাত থেকে বাঁচাতে হলে কিছু একটা করতেই হবে। নতুবা ভবিষ্যত অন্ধকার। মানুষ পাকিয়ে পাকিয়ে দড়ি তৈরী করে নানা কাজে সাহায্যের জন্যে। কিন্তু সেই দড়ি যদি মানুষ কেবলমাত্র গলায় দেবার জন্যেই প্রয়োগ করতে থাকে, তবে দড়ি তৈরী আর তার ব্যবহার কিছুদিন বন্ধ রাখা উচিত নয় কি?

দুপুরের ট্রেনটা রাতে পৌঁছায়। সেদিন আর জীবনের পক্ষে রমেনের দোকানে যাওয়া সম্ভব হয় না। সকালে এতটুকু গাফিলতি না করে জীবন ঠিক সময়ে রমেনের দোকানে আসে। কিন্তু একি! ভূদেব বসে রয়েছে না! হ্যা ভূদেবই তো! জীবন রমেনের দোকানের

দায়িত্ব নেবার পর ভূদেব কখনো রমেনের দোকানে আসেনি। ভূদেবকে দোকানে দেখে জীবন বলে—কিরে ভূদেব, পথ ভুলে নাকি ?

ভূদেবের মুখে হাসি নেই। গলার স্বর কর্কশ।

—ছেলের দোকানে বাপ্ বস্‌বে এতে পথ ভোলার কি আছে ? কখন কিভাবে কার সঙ্গে কি কথা বলতে হয় তাও শিখলি না। রমেনকে এখন থেকে আমিই সাহায্য করব। তোকে আর দোকানে আসতে হবে না।

স্থির দৃষ্টিতে জীবন ভূদেবের দিকে তাকিয়ে থাকে। জীবনের পা তুটো কাঁপছে। থর থর কাঁপছে। দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এখানে আর এক মুহূর্তও থাকা উচিত নয়। এবার হয়ত ভূদেব গালাগালি করবে। গলা ধাক্কাও দিতে পারে।

রমেন টিপ্পনি কাটে।

—কাকু, যেমন কলি তেমনি বলি। এত শিখেছেন, এটুকু শেখেননি !

হি হি। রমেন হাসে। ভূদেবের মুখে কোন প্রতিবাদ নেই। পায়ে পায়ে জীবন রমেনের দোকান থেকে বেরিয়ে আসে। বাজারের রাস্তা দিয়ে বাড়ী ফিরছে। অন্যদিন ফেরার পথে কত দোকানদার জীবনকে নমস্কার জানাতো। কত কথা কইত। এক মিনিটের পথ দশ মিনিট লাগত। কিন্তু আজ ! কেউ ডাকছে না। নমস্কার তো দূরের কথা। ডানদিকের দোকানটা থেকে কি যেন বলছে ! জীবন কান খাড়া করে।

—ঐ দেখ্, জীবন মুহুরী যাচ্ছে। সুবল কর্মকার এর কথাই তো বলে গেছে না রে ? যে দোকানে ঢুক্‌বে সেই দোকানই উঠে যাবে।

বাঁ দিকের দোকানদারটার গলার স্বর আরও চড়া।

—শুধু সুবলদা বলবে কেন ? বড় সাহেব, অরূপ মস্তান, অফিসার সাহেব সবাই বলেছে। আসলে লোকটা একটা আস্ত পাগল।

জীবনের শরীর কাঁপছে। কোন রকমে বাড়ী পৌঁছায়। তুচোখে জলের ঝাপ্‌টা দেয়।

—বাবা কি হ'ল ? চোখে জল দিচ্ছেন কেন ?

বৌমা জিজ্ঞেস করে।

—চোখে পোকা।

জীবন গলার স্বর স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে।

প্রায় তিন মাস হতে এলো জীবন রাস্তায় বের হয়নি। উৎপলের শ্বশুর চিঠি দিয়েছে। উত্তর দিতে হবে। জীবন কলমটা খুঁজে পায় না। তাইতো! কলম পড়ে আছে, রমেনের দোকানে। কি আশ্চর্য, কেউ কলমটা দিয়ে যেতে পারল না! একটা বিশেষ কারণে রমলা কলমটা জীবনকে উপহার দিয়েছিল। সে কি আজকের কথা! বাধ্য হয়ে জীবন রমেনের দোকানে যায়। জীবন দোকানে ঢুকবে না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিজের জিনিসটা চেয়ে নেবে। কিন্তু রমেনের দোকানের সামনে পৌঁছে জীবন অবাক হয়ে যায়। এক নজরে সে যেন সমগ্র আধুনিক ভারতবর্ষটাকে আবিষ্কার করে ফেলেছে। যেন তার দিব্য দর্শন হয়েছে। ভূদেব নিজের নামে রেশনের ডিলারশিপ বাগিয়েছে। দড়মার ঘের দিয়ে রমেনের দোকানটাকে দুভাগ করে নিয়েছে। রেশনের দিকে ভূদেব নিজে বসেছে। মুদিখানা আর চালের দিকে রমেন বসেছে। দোকানে যেমনি ভিড়, তেমনি বেচাকেনা। কাউকে কোন জিনিস খুঁজে দেওয়া কিম্বা কারোর সঙ্গে ফালতু কথা বলার সময় কোথায় ওদের ! মাথা নীচু করে জীবন আবার বাড়ী ফিরে আসে !

দশ

স্কুলে ছুটি থাকলেই কমলা আজকাল বাপের বাড়ী চলে আসে। শ্রেষ্ঠাকে ওর দারুণ পছন্দ। শ্রেষ্ঠার আদো আদো কথা, ভাঙা ভাঙা শব্দে গান করার চেষ্টা কমলার কাছে বিস্ময়কর লাগে। মেয়েটাও এমন হয়েছে যে মায়ের কোলের চেয়ে দাদু পিসীর কোলই ওর কাছে বেশী সুখের। কমলা না থাকলে দাদুই তার একমাত্র সাথী। কিন্তু কমলা এলে শ্রেষ্ঠা আর কারুর নয়।

কিছুদিন হ'ল কমলার বাসাতে যে মেয়েটা কাজে লেগেছে মেয়েটা বেশ কাজের। কমলা বাপের বাড়ী এলে নিরামিষ রান্নাগুলো মেয়েটা বেশ ভালই সেরে রাখে। মেয়েটা যেমনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হাতের রান্নাও তেমনি ভাল। ওকে পেয়ে কমলার বেশ সুবিধে হয়েছে। যেদিন ছুটি থাকে সেদিন কমলাকে বাসাতে থাকতে হয়। বাসায় একা একা কমলা ছটফট করে। দম বন্ধ হয়ে আসে। স্কুলে যাওয়ার আগে, স্কুল থেকে ফিরে, এমন কি গভীর রাত অবধি কমলা কি যেন চিন্তা করে। কমলার এই অস্বাভাবিক অবস্থা কাজের মেয়েটারও দৃষ্টি এড়ায়নি। প্রায়ই কমলা কিছু লিখতে চেষ্টা করে। কিন্তু দু' এক লাইন লিখেই কাগজটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দেয়। ঘর ঝাঁট দিতে এসে কাজের মেয়েটা একদিন বলেই ফেলে—দিদিমণি, ছোট ছেলেদের মত তুমি এত কাগজ ছেঁড় কেন? রাতদিন এত কি ভাব?

কমলা থতমত খায়। এ ধরণের সরল প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে কমলা ভাবেনি।

—ঐ ঐ কবিতা লিখতে চেষ্টা করি! ঠিক হয় না। ছিঁড়ে ফেলি।

আজ কমলার ছুটি ছিল। বড়জোর ঘণ্টাখানেক হবে বাপের বাড়ী

এসে শ্রেষ্ঠাকে নিয়ে খেলায় মেতেছে। রিক্সা ছুটিয়ে কমলার কাজের মেয়েটা আসে।

—কিরে তুই ?

কমলা আঁতকে ওঠে। যেন ভুত দেখেছে।

—এক বাবু এসেছে। তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।

—কে বাবু ? কেমন দেখতে ?

—কালো মত।

—প্যান্ট পরা না ধুতি পরা ?

—প্যান্ট পরা।

যাক্, রামলাল হতে পারে না। কমলা মনে মনে বলে।

—তুই বেলা বারোটার পর আসতে বল্লি না কেন ?

—বল্লাম তো। বল্ল তোমাকে ভীষণ দরকার। তোমাকে ডেকে নিয়ে যেতে বল্ল। আমাকে গাড়ি ডেকে দিল।

কমলা গভীরভাবে চিন্তা করে—লোকটা কে হতে পারে। কাজের মেয়েটাকে কাছে ডাকে।

—মোটর গাড়ি করে এসেছে নাকি রে ?

—না দিদিমণি, হেঁটে এসেছে।

ফিস ফিস করে মেয়েটা বলে।

তবে কি স্কুল থেকে কেউ এসেছে ! কমলা চিন্তা করে। হেড দিদিমণি কাউকে কোন বিশেষ কাজে পাঠাননি তো ? শ্রেষ্ঠার সঙ্গে খেলার ভারটা কাজের মেয়েটাকে দিয়ে কমলা চলে আসে নিজের বাসায়। নীচের বৈঠকখানা ঘরের পর্দাটা ফাঁক করে কমলা যাকে দেখতে পায়, তার জন্যেই ক'মাস ধরে সে কাগজ ছিঁড়েছে। সব সময় চিন্তিত থেকেছে। তিলে তিলে অতিবাহিত করেছে কত না বিনিদ্র রজনী। রামলাল এসেছে।

এক ঝলক কমলাকে দেখে হাসি মুখে রামলাল বলে—মিষ্টির দোকান থেকে ভাইয়াকে তোমার খোঁজ নিতে পাঠিয়েছিলাম। ভাইয়ার কাছে

জানলাম, তোমার কাজের মেয়েটা তোমাকে ডাকতে গিয়েছে। না জানিয়ে এসেছি বলে বিরক্ত হলে?

—না না বিরক্ত হব কেন! আসুন, ওপরে আসুন।

কমলা যত্ন করে রামলালকে চেয়ারে বসায়। আন্তরিক আগ্রহে জিজ্ঞেস করে—কেমন আছেন?

রামলাল কমলার মুখের দিকে তাকায়। চম্‌কে ওঠে। ভ্রু—কুঁচকায়।

—কি হয়েছে তোমার? ক'মাসের মধ্যে বুড়ি হয়ে গেলে কি করে? দু' একটা দাঁত পড়ে গেলে তো দিদিমা বলে ডাকা যেত। শক্ত অসুখ করেছিল নাকি?

—অসুখ করলে তো বাঁচতাম! তবে মানুষের জীবনে যা কিছু অপ্রয়োজনীয় তা যত তাড়াতাড়ি হারিয়ে যায় ততই ভাল। মানুষ বোঝা টানার হাত থেকে রেহাই পায়।

রামলাল চুপ করে থাকে। কথা বলার সাহস পায় না। অনেক আশা নিয়ে রামলাল আজ এসেছে। প্রতিদিন হৃদপিণ্ডের এত যন্ত্রণা সে আর সইতে পারে না। যেমন করেই হোক কমলাকে আজ রাজী করাতেই হবে। কথাবার্তায় রামলাল তাই আজ খুব সাবধান। এমন কোন কথা রামলাল আজ বলতে রাজী নয় যাতে কমলা বিরক্ত হয়। বেশ কিছু চিন্তা করে রামলাল বলে—তুমি আমাকে জানাবে বলেছিলে। কিন্তু চার মাস হয়ে গেল কিছু জানালে না। এভাবে কি বাঁচা যায়?

কমলার মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে যায়। মাঘ মাসের পূর্ণিমার আকাশ।

—কি জানাই বলুন? কতবার কিছু জানাতে চেষ্টা করেছি, পারিনি। আসলে আমার বাগানে এমন একটিও তাজা ফুল নেই যা দিয়ে আপনার জন্যে মালা গাঁথি। মনটা আমার মরুভূমি হয়ে গেছে।

—দারুণ শিলা বৃষ্টিতে দুনিয়ার কত সুন্দর বাগান ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু ওস্তাদ মালির নিপুণ হাতে আবার সে বাগানে ফুল ফোটে। বাগান আবার সুন্দর হয়। আমাকে না হয় তোমার বাগানের মালির

কাজটুকুই দাও। তুমি কলকাতায় থাক। আমি তোমায় ফ্ল্যাট ভাড়া করে দেব। মাঝে মাঝে তোমার সঙ্গে দেখা করব।

—তা হয় না রামলালদা! এই ঘরটুকু ছেড়ে আমি কোথাও থাকতে পারব না।

—কিন্তু আমি যে তোমায় না দেখে থাকতে পারি না। তুমি নিজে যতদিন না বল্ছ, আমি কোনদিন আমার জীবনের সঙ্গে তোমার জীবনকে বাঁধার অনুরোধ করব না। আমাকে অবিশ্বাস কোরোনা কমলা। আমার প্রাণ থাকতে আমি তোমার এতটুকু ক্ষতি হতে দেব না।

—আপনার প্রতি আমার এতটুকু অবিশ্বাস নেই। বরং মনপ্রাণ দিয়ে আমি আপনাকে বিশ্বাস করি। শ্রদ্ধা করি।

—তাহলে কলকাতায় গিয়ে থাকতে তোমার আপত্তি কেন? বেশ, তুমি যাতে কোন ভাল স্কুলে মাষ্টারী করতে পার, আমি না হয় তারও ব্যবস্থা করব।

—তাতেও আমি শান্তি পাব না।

রামলাল এবার চুপ করে যেতে বাধ্য হয়। কমলা আপাদমস্তক সাদা থানে মুড়ে ঘরের এক কোণে মোড়ার ওপর মাথা নীচু করে বসে থাকে।

একটু পরে রামলাল কথা বলে।

—কমলা, অতীতকে ভুলে যাও। অতীতকে আঁকড়ে থেকে দুটো জীবনকে খুন কোরো না। এটা পাপ।

—অতীতকে ভুলতে আমি অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু পারলাম কৈ!

—কিন্তু আমি যে তোমায় ভালবাসি। আমি তবে বাঁচব কি নিয়ে?

—আপনি জ্ঞানী মানুষ। জ্ঞানের গভীরতা দিয়ে নিজেই নিজের বাঁচার পথ খুঁজে নিতে পারবেন।

কমলা নিষ্ঠুর। কমলা দাম্ভিক। কমলা হৃদয়হীন। আত্মসমর্পণ করেও যেখানে আশ্বাসের হদিশ মেলে না, বিদ্রোহ সেখানে অনিবার্য।

রামলালের সমস্ত ধৈর্য, সংযম ভেঙে পড়ে তাসের ঘরের মত। চিৎকার করে।

—এই যখন তোমার শেষ কথা, প্রথম যেদিন এসেছিলাম, সেদিনই অপমান করে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দাওনি কেন? কেন গুণ্ডা দিয়ে আবার মার খাইয়ে আমার লাশ ফেলে দাওনি?

রামলাল রুমাল দিয়ে মুখ ঢাকে।

ধীর পায়ে কমলা এগিয়ে আসে রামলালের দিকে। হাত জোড় করে।

—পায়ে পড়ি আপনার। অমন করে বলবেন না। ক'মাস ধরে বিবেকের তীব্র দংশনে আমি যে কিভাবে নিজের কাছে নিজে ছিন্নভিন্ন হচ্ছি, কষ্ট পাচ্ছি, তা আপনাকে বোঝাই কি করে? আপনাকে ফিরিয়ে দিয়ে আমি যে শান্তি পাব তা মোটেই ভাববেন না।

চোখের জলে মনের ভারে কমলার গলার স্বর বন্ধ হয়ে আস্‌ছে। কথা আর বের হতে চাইছে না। তবু সে আরও কয়েক পা এগিয়ে যায় রামলালের দিকে। রামলালের দিকে গভীরভাবে তাকায়। আরো এগিয়ে যায়। চেয়ারের হাতল দুটো চেপে ধরে। ঠোঁটে ঠোঁট লাগ্‌তে আর সামান্য দূরত্ব।

রামলালের মুখের রুমালটা ভিজে গেছে। চিবুক বেয়ে নেমে আসছে অশ্রুধারা। কমলা বলে—এই দেখ, আমি এসেছি। তোমার কাছে এসেছি। চেয়ে দেখ।

ধীরে ধীরে রুমালটা সরে যায় রামলালের মুখের ওপর থেকে। গোলাপ-রাঙা চোখ দুটো মেলে ধরে কমলার দিকে। কমলাও তার করুণা নম্র, স্নিগ্ধ-শান্ত দৃষ্টি মেলে অপলকে চেয়ে থাকে রামলালের দিকে। রামলাল দেখছে কমলাকে, কমলা দেখছে রামলালকে।

থানের প্রান্তটা দুই হাত দিয়ে ঘাড়ের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে কমলা হাঁটু ভেঙে বসে। কপালটা রামলালের দুই পায়ের ফাঁকে মেঝেতে ছুঁইয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে।

—ঠাকুর তুমি আমায় ক্ষমা কর। সারা জীবন ধরে আমাকে আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও। কখনো তোমায় ভুলব না। ভুলতে পারব না।

কখন কমলা উঠে গেছে রামলাল জানে না। কমলার চোখের জলের বিন্দুগুলো সাদা মেঝের উপর তখনো মুক্তর মত ঝলমল করছে। স্থির দৃষ্টিতে সেই মুক্তগুলোর দিকে তাকিয়ে রামলাল পাথরের মূর্তির মত বসে থাকে।

স মা প্ত